আরেক রকম

অষ্টম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা
১-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ ১৬-২৯ মাঘ ১৪২৬

মূল্য : ৩০ টাকা

আরেক রকম

পাক্ষিক পত্রিকা, মাসের ১লা ও ১৬ই প্রকাশিত
স্বত্বাধিকারী : সমাজ চর্চা ট্রাস্ট

সম্পাদক
শুভনীল চৌধুরী
subhanilc@gmail.com

সম্পাদকীয় দপ্তর
আরেক রকম
৩৯এ/১এ বোসপুকুর রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৪২
প্রতি সংখ্যা ৩০ টাকা
বার্ষিক সডাক ৭০০ টাকা
এককালীন ৫০০০.০০ টাকা দিয়ে 'সমাজ চর্চা ট্রাস্ট'-এর সদস্য হলে তাঁকে *আরেক রকম*-এর স্থায়ী গ্রাহক করে নেওয়া হবে।

arekrakam@gmail.com
samajcharcha@gmail.com

স্বত্বাধিকারী
সমাজ চর্চা ট্রাস্ট
কমার্শিয়াল কমপ্লেকস (চতুর্থ তল)
৮১/২/৭ ফিয়ার্স লেন
কলকাতা ৭০০ ০১২

গ্রাহক পরিষেবা
রবিন মজুমদার
৯৪৩২২১৯৪৪৬

আরেক রকম

অষ্টম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা ১-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০,
১৬-২৯ মাঘ ১৪২৬
Vol. 8, Issue 3rd, Arek Rakam RNI No. WBBEN/2013/49896

সূ ◆ চি ◆ প ◆ ত্র

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক: অশোক মিত্র

উপদেষ্টা: অমিয়কুমার বাগচী

সম্পাদক
শুভনীল চৌধুরী

সম্পাদকমণ্ডলী
গৌরী চট্টোপাধ্যায়
কালীকৃষ্ণ গুহ
প্রণব বিশ্বাস
ইমানুল হক
শাক্যজিৎ ভট্টাচার্য
অমিতাভ রায়

প্রচ্ছদ
নামলিপি: হিরণ মিত্র
ছবি: ধীরাজ চৌধুরী
ভেতরের ছবি: সুদীপ ব্যানার্জি

পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার
৪ টোটি লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৬
ফোন: ০৩৩-৪০৬৪-৪০৯৭, ৪১০৩, ৬৩৫৩

বাংলাদেশ পরিবেশক
পাঠক সমাবেশ
শাহবাগ, ঢাকা ১০০০

আরেক রকম পত্রিকার জন্য যোগাযোগ স্থল
শিলিগুড়ি: নন্দদুলাল দেবনাথ, ৯৪৭৪৩৮৩৪৪২
বোলপুর: সোমনাথ সমাদ্দার, ৯৪৭৫৩৬৩৩৫২

ওয়েব সাইট: www.arekrakam.com

প্রতি সংখ্যা ত্রিশ টাকা

বার্ষিক সডাক সাতশো টাকা

এককালীন ৫০০০.০০ টাকা দিয়ে 'সমাজ চর্চা ট্রাস্ট'-এর সদস্য হলে *আরেক রকম* আজীবন বিনামূল্যে পাওয়া যাবে।

সম্পাদকীয়
শ্রেণির আত্মহত্যা ৫
'টুকড়ে টুকড়ে গ্যাং'-এর সন্ধানে ৭

সমসাময়িক
লালায় বিষ ৯
বিরোধী ঐক্যে ফাটল ১০
সুপ্রিম কোর্টের দীর্ঘসূত্রিতা ১২

মাতৃত্ব যখন প্রতিরোধের ভাষা
সুপর্ণা ব্যানার্জি ১৪

অপ্রকাশিত রাশিয়ার জার্নাল থেকে
বার্লিন প্রাচীরের ২৫তম বার্ষিকী
অরুণ সোম ১৬

বেলুড় মঠে মোদী!
গৌতম রায় ২১

আতঙ্কগ্রস্ততা
তৃষিতানন্দ রায় ২৬

বাস্তুচ্যুতি ও দেশান্তরী কান্নার বীজ
গৌতম গুহ রায় ২৮

আমার কলকাতা
অশোককুমার মুখোপাধ্যায় ৩৭

জনশ্রুতি ও বিদ্যাসাগর
শ্যামাপ্রসাদ বসু ৪১

কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিবেকের মতো
অতনু ভট্টাচার্য ৪৪

খেজুর রসে খেজুরে আলাপ
গৌতমকুমার দাস ৪৭

অক্ষয়বটের দেশ
না-লেখকদের কথা
কালীকৃষ্ণ গুহ ৫০

চিঠির বাক্সো ৫৫

পুনঃপাঠ
ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ
মৃণাল সেন ৫৬

সমাজ চর্চা ট্রাস্ট-এর পক্ষে তৃষিতানন্দ রায় কর্তৃক ৩৯এ/১এ, বোসপুকুর রোড, কলকাতা-৭০০ ০৪২ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক এস. পি. কমিউনিকেশনস্ প্রা. লি., ৩১বি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

আরেক রকম চিন্তাধারায় লালিত থীমার বই। বইমেলায় ২৫৪ নম্বর স্টল-এ।

শতবর্ষীয়ান করুণা ও সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়-এর রচনা। দুর্লভ চিত্রসংবলিত।

সর্বজয়াচরিত্র। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুদেষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। চিরস্মরণীয় অভিনেত্রীর ছোটো গল্প, চলচ্চিত্রস্মৃতি ও চলচ্চিত্রবিচারসহ সমগ্র রচনা, সাক্ষাৎকার, দিনলিপি, পত্রগুচ্ছ।

An Actress in Her Time. KARUNA BANERJEE. Her writings in English, offering a critical cultural history of her times with rare insights into Ray's filmmaking. Second edition.

Fragments of Time : Memoirs of a Romantic Revolutionary. SUBRATA BANERJEE. Published by CRRID Chandigarh. Distributed by Thema.

আশাদির দেওয়া খাতাখানি। সম্পূর্ণা দেবী।

গত দিনের যত কথা। কল্যাণী দত্ত।

জীবনের টানে শিল্পের টানে। রেবা রায়চৌধুরী।

ওঁরা, আমরা, এরা। শোভা সেন।

শতবর্ষীয়ান জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিবাদিত্য দাশগুপ্ত সম্পাদিত।

নিশির ডাক। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

Spooky Encounters : Gossip and Banter with Marx. SUMANTA BANERJEE.

Years of Laughter : Reminiscences of a Cartoonist. P K S KUTTY.

Talking the Political Culturally and Other Essays. G P DESHPANDE.

প্রচ্ছন্নের আখ্যান। রুশতী সেন।

অজিতেশের শেষ ঠিকানা। রত্না বন্দ্যোপাধ্যায়।

যুদ্ধের ছায়ায়। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত।

সমবায়ী শিল্পের গরজে। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত।

ঠিকানা কলকাতা। সুনীল মুন্সী। দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ।

অনেক মুখ অনেক মুহূর্ত। মৃণাল সেন।

মান্টোর খোলা চিঠি : সাহিত্যিকের কলমে রাজনীতির ভাষ্য। সোমেশ্বর ভৌমিক।

মণিকুন্তলা সেন : জনজাগরণে নারীজাগরণে।

বটুকদার গান। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের সুরারোপিত স্বরলিপি। প্রসূন দাশগুপ্ত সম্পাদিত।

মোর বন্ধু কাজলভোমরা। কালী দাশগুপ্ত।

প্রসঙ্গ বাংলা গান। রাজেশ্বর মিত্র। বাংলা গানের সমীক্ষা। সঙ্গে স্বরলিপিসহ নিধুবাবু, দাশরথি রায় ও শ্রীধর কথকের নির্বাচিত গান। ইন্দিরা সংগীত শিক্ষায়তনের সঙ্গে যৌথ প্রকাশনা।

মূল রুশ থেকে কৌশিক গুহ অনুবাদিত

মারিনা স্ভেতায়েভার কবিতা। রুশ কবিতার মূল ধারার আড়ালে প্রায় গোপন এক অসামান্য কবির দুর্লভ কবিতাবলি। পূর্বপ্রকাশিত।

সূর্যমুখীর আলো : তলস্তয়-এর ছোটোদের গল্প। দেবব্রত ঘোষ চিত্রিত। প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০২০।

থীমা | **৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা ৭০০ ০২৬। দূরভাষ: ৮৪২০১২৪৫৪১/২৪৬৬ ৭৭৯৪**

email: themabooks@yahoo.com / website: www.themabooks.com

আরেক রকম

সম্পাদকীয়

শ্রেণির আত্মহত্যা

যখন আপনি এই নিবন্ধটি পড়ছেন, তখন হয়তো কোনো বেকার চাকুরিহীন যুবক-যুবতী আত্মহত্যা করছে। চমকে উঠলেন? কিন্তু এটাই সত্য। ভারতের অপরাধ তথ্য ভাণ্ডারের রিপোর্ট জানাচ্ছে ২০১৮ সালে ভারতে ১২৯৩৬ জন কর্মহীন মানুষ আত্মহত্যা করেছেন। অর্থাৎ, প্রত্যেকদিন গড়ে ৩৫ জন বেকার বা প্রতিঘণ্টা একের বেশি কর্মহীন মানুষ ভারতে আত্মহত্যা করছেন। তাই আপনার অবসর সময় আপনি *আরেক রকম*-এর এই সংখ্যা পাঠ করতে করতেই আরো একজন কর্মহীন মানুষ নিজের জীবন শেষ করে দেবেন এই ভারতে। উন্নত ভারত, একবিংশ শতাব্দীর ভারতে বেকারত্বের গ্লানিতে হাজার হাজার মানুষ নিজেদের মহামূল্যবান জীবন শেষ করে দিচ্ছেন আর আমরা লড়ে যাচ্ছি হিন্দু-মুসলমান নিয়ে, খুঁজে বেড়াচ্ছি কাগজ প্রমাণ করতে যে আমরা ভারতীয়।

ভারতে কৃষক আত্মহত্যা নিয়ে আমরা অনেক আলোচনা শুনেছি। কিন্তু ২০১৮ সালে কর্মহীন মানুষের আত্মহত্যার সংখ্যা কৃষকদের থেকেও বেশি হয়েছে, সম্ভবত প্রথমবার। কৃষক হত্যার কারণ কী তা নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। আমরা জেনেছি যে ঋণের ভারে জর্জরিত, ফসলের দাম না পাওয়া চাষিরা অনাহারে অপমানে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু বেকার কর্মহীন মানুষের এই বিপুল পরিমাণ আত্মহত্যা নিয়ে সর্বজনীন পরিসরে কোনো আলোচনা নেই। কিন্তু ভারতের অর্থব্যবস্থায় কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তথ্যের দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে বেকারত্ব এক ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।

শিল্পে ভাটার টান এবং অর্থব্যবস্থায় সার্বিক মন্দাবস্থার দরুন ভারতে বেকারত্বের হার প্রায় সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। সরকার দ্বারা প্রকাশিত কর্মসংস্থান সংক্রান্ত সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী দেশে বেকারত্বের হার ২০১৭-১৮ সালে ছিল ৬.১ শতাংশ যা বিগত ৪৫ বছরে সর্বোচ্চ। কিন্তু ২০১৭-১৮ সালের পরে সরকারি পরিসংখ্যান না থাকলেও বেসরকারি সংস্থা CMIE (Centre for Monitoring Indian Economy) নিয়মিত কর্মসংস্থান সংক্রান্ত সমীক্ষা নির্ভর তথ্য প্রকাশ করে। তাদের সর্বশেষ রিপোর্ট বলছে সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৯ ত্রৈমাসিকে ভারতে বেকারত্বের হার ছিল ৭.৫২ শতাংশ। এই সংখ্যাকে যদি বিস্তৃতভাবে পর্যালোচনা করা হয় তবে এক ভয়াবহ চিত্র ফুটে ওঠে। CMIE রিপোর্ট জানাচ্ছে যে পুরুষদের মধ্যে এই হার ৬.২ শতাংশ হলেও মহিলাদের মধ্যে এই হার

১৭.৫ শতাংশ, আর শহরের মহিলাদের ক্ষেত্রে এই হার সমস্ত রেকর্ড ভেঙে ২৬ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ, শহরে প্রতি চার জন মহিলার একজন বেকারত্বের গ্লানি ভোগ করছেন। মনে রাখতে হবে যে বেকারত্ব মানে তাঁরা কাজ খুঁজছেন কিন্তু পাচ্ছেন না। গৃহবধূরা অতএব এই হিসেবে পড়েন না। লিঙ্গভিত্তিক বেকারত্বের হার দেখাচ্ছে যে মহিলারা আমাদের দেশে কাজ খুঁজেও পাচ্ছেন না। আমরা যদি বয়স ভিত্তিক বেকারত্বের হারের দিকে তাকাই তবে অর্থব্যবস্থার শোচনীয়তা আরো প্রকট হবে। CMIE রিপোর্ট বলছে যে ১৫-১৯ বয়সীদের মধ্যে বেকারত্বের হার ৪৫ শতাংশ, ২০-২৪ বয়সিদের মধ্যে এই হার ৩৭ শতাংশ এবং ২৫-২৯ বছরের তরুণদের মধ্যে বেকারত্বের হার ১১ শতাংশ। অর্থাৎ, যেই তরুণদের স্বপ্ন দেখিয়ে মোদী ক্ষমতায় এসেছিলেন, তাদের মধ্যে অধিকাংশই বেকার, কাজ নেই। তরুণরা যদি এই পরিমাণে বেকারত্বের শিকার হন তবে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার তা বলা বাহুল্য।

দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবার আগেই কর্মহীন মানুষেরা আত্মহত্যা করছেন। তবে শুধু কর্মহীন মানুষ নয়। সরকারি তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে ৩০১২৭ জন দিনমজুর ২০১৮ সালে আত্মহত্যা করেছেন। পেশাগতভাবে যদি আত্মহত্যাকারীদের ভাগ করা যায় তবে দেখা যাচ্ছে যে দিনমজুররা সব থেকে বেশি আত্মহত্যা করেছেন, যার পরে রয়েছে গৃহবধূদের স্থান। আমাদের অনেকের মধ্যে একটা ধারণা চালু আছে যে আত্মহত্যা বোধহয় মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত মানুষেরা করেন। খবরের কাগজ বা সংবাদমাধ্যমে গরিব খেটে খাওয়া মানুষদের আত্মহত্যার খবর প্রকাশিত হয় না। তাই তাদের আত্মহত্যার আখ্যান আমাদের শহুরে মধ্যবিত্ত জীবনের বাইরে রয়ে যায়। কিন্তু তথ্য বলছে হাজার হাজার গরিব খেটে-খাওয়া মানুষ আমাদের দেশে আত্মহত্যা করছেন। তাদের কথা আলোচিত হচ্ছে না।

২০১৮ সালে ভারতে মোট ১৩৪৫১৬ জন মানুষ আত্মহত্যা করেন। এদের মধ্যে ৮৮৯৮৬ জন মানুষের বার্ষিক আয় ১ লক্ষ টাকার কম। অর্থাৎ, ভারতের মোট আত্মহত্যাকারীর মধ্যে ৬৬ শতাংশ মানুষ সমাজের প্রান্তিক গরিব শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। জীবনযুদ্ধে লড়তে লড়তে জীবনের প্রতি সমস্ত ভালোবাসা, আশা, আলো হারিয়ে আত্মহত্যা করছেন কাতারে কাতারে মানুষ। আমাদের সমাজ তাদের ব্যথা বুঝতে অক্ষম হয়েছে, সামগ্রিকভাবে আমরা এই মানুষগুলির চোখে ব্যর্থ হয়েছি, এই কথা আমাদের মেনে নিতে হবে।

আত্মহত্যাকারীর শ্রেণি বিন্যাস থেকে আমরা রাজনৈতিক অর্থনীতির কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা চিহ্নিত করতে পারি। আমাদের দেশে আর্থিক বৈষম্য ঐতিহাসিক পর্যায় পৌঁছিয়েছে। খবরে প্রকাশিত হয়েছে যে ভারতের সর্বাধিক ধনী ৬৩ জন শিল্পপতির মোট সম্পদের পরিমাণ কেন্দ্রীয় বাজেটে মোট বরাদ্দ টাকার পরিমাণ ছাপিয়ে গিয়েছে। ভারতের সর্বাধিক ধনী ৯ ব্যক্তির সম্পদের পরিমাণ দেশের দরিদ্র ৫০ শতাংশ মানুষের সমান। অর্থাৎ, সম্পদের নিরিখে যদি ভারতের সমস্ত মানুষকে একটি লাইনে দাঁড় করানো হয় তবে প্রথম নয় জনের সম্পদের মোট পরিমাণ শেষ থেকে ৫০ শতাংশ মানুষের সমান হবে। এই ভয়াবহ আর্থিক বৈষম্য পৃথিবীর প্রায় আর কোনো দেশেই নেই।

এর মধ্যে বসবাসকারী দরিদ্র মানুষের কথা এবার ভাবুন। বিগত ৩-৪ বছর ধরে গ্রামীণ মজুরি কমছে। আর্থিক বৃদ্ধির হার তলানিতে, বেকারত্বের হার ঊর্ধ্বগামী। এই পরিস্থিতিতে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমেছে। ১৯৭২-৭৩ সালের পরে প্রথমবার ২০১৭-১৮ সালে পরিবারের মাথা পিছু গড় ব্যয় কমে গিয়েছে। ২০১১-১২ সালে একজন ব্যক্তি গড়ে ১৫০১ টাকা মাসে ভোগ্যপণ্যে খরচ করতেন, যা ২০১৭-১৮ সালে কমে হয়েছে ১৪৪৬ টাকা (২০০৯-১০ সালের অর্থমূল্যে এই তুলনা করা হয়েছে)। ২০১১-১২ এবং ২০১৭-১৮ সালের মধ্যে গ্রামীণ ভারতে এই খরচ কমেছে ৮.৮ শতাংশ, এবং শহরে এই খরচ বেড়েছে মাত্র ২ শতাংশ। অর্থাৎ গ্রামীণ ভারতে প্রবলভাবে ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। কৃষি সংকট, কৃষক আত্মহত্যা, গ্রাম থেকে শহরে আসা মানুষের বাড়তে থাকা স্রোত এই ক্রয়ক্ষমতা হ্রাসের সংকটের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস হলে দারিদ্র্য বাড়ে, কারণ আমাদের দেশে দারিদ্র্য পরিমাপ করা হয় এই খরচের নিরিখে। অপ্রকাশিত ফাঁস হওয়া কেন্দ্রীয় রিপোর্টের ভিত্তিতে অর্থনীতিবিদরা গণনা করে দেখেছেন যে ২০১১-১২ সালে যেখানে গ্রামীণ ভারতে দারিদ্র্যের হার ছিল ২৫.৭ শতাংশ তা ২০১৭-১৮ সালে বেড়ে হয়েছে ২৯.৬ শতাংশ। সমগ্র ভারতের ক্ষেত্রেও দারিদ্র্যের হার ২২ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ২২.৮ শতাংশ (সূত্র: livemint.com)। একবিংশ শতাব্দীতে ভারতের মতন তথাকথিত আর্থিকভাবে উদীয়মান দেশে বেকারত্বের হার বাড়ছে, এর থেকে লজ্জার কথা আর কী হতে পারে। দারিদ্র্যের হার বৃদ্ধি দেখাচ্ছে যে দেশে আর্থিক সংকটের গভীরতা নিছক আর্থিক বৃদ্ধির হারের হিসেবের বাইরে বেরিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনজীবিকা গভীর সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

এই ভয়াবহ সংকটের প্রতিচ্ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি আত্মহত্যার তথ্যে। এমন নয় যে দরিদ্র মানুষের সংকট শুধু মোদীর আমলেই হয়েছে। এমনও নয় যে মোদী আমলেই সব থেকে বেশি গরিব মানুষ আত্মহত্যা করেছেন। কিন্তু নিশ্চিতভাবে একথা বলা যায় যে মোদী আমলে দরিদ্র মানুষের আর্থিক অবস্থার আরো অবনতি হয়েছে। এবং সার্বিকভাবে বলা যায় যে গরিব মানুষের জীবনের মানোন্নয়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের সহ নাগরিকেরা হাজারে হাজারে নিদারুণ দারিদ্রে আত্মহত্যা করছেন আর আমরা নির্বিঘ্নে আমাদের আরামের জীবন চালিয়ে যাচ্ছি। এই মানুষগুলির রাগ, হতাশা ঘুরে গিয়েছে নিজেদের দিকে। কিন্তু বাম রাজনীতির কাজ এই মানুষগুলিকে একত্রিত করে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা। আপাতত সেই দীর্ঘ প্রতীক্ষা চলছে।

‘টুকড়ে টুকড়ে গ্যাং’-এর সন্ধানে

জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫ জানুয়ারি ঘটে যাওয়া নারকীয় হিন্দুত্ববাদী গুন্ডাদের হামলার দিন কয়েক আগে অমিত শাহ দিল্লির একটি সভায় বলেছিলেন যে ‘টুকড়ে টুকড়ে গ্যাং’-কে উচিত শিক্ষা দেওয়ার সময় এসে গিয়েছে। এই তিনটি শব্দ ‘টুকড়ে টুকড়ে গ্যাং’, ভারতের রাজনৈতিক ভাষ্যে বিজেপি মসনদে বসার আগে কোনোদিন শোনা যায়নি। কিন্তু এখন বিজেপি-র বিরুদ্ধে কোনো অবস্থান নিলে, সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে সটান বলে দেওয়া হয় বিরোধীরা ‘টুকড়ে টুকড়ে গ্যাং’-এর সদস্য।

মজার ব্যাপার হল বিজেপি-র ফ্যাসিস্ত মতাদর্শের মতোই এই শব্দবন্ধটিও ধার করা। ২০১৬ সালে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সংসদ সভাপতি কানহাইয়া কুমারকে গ্রেপ্তার করার সময় বলা হয় যে বিশ্ববিদ্যালয়ে নাকি ভারতকে ভেঙে টুকরো করে দেওয়ার স্লোগান উঠেছে। যদিও সেই ভিডিওটি যে জাল ছিল তা প্রমাণিত হয়েছে তবু বিজেপির পোষ্য সাংবাদিক যিনি রোজ টিভির পরদায় এসে তারস্বরে চিৎকার করে সরাসরি উশকানিমূলক কথা বলেন, তিনি জেএনইউ-র ঘটনার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজকে ‘টুকড়ে টুকড়ে গ্যাং’ বলে অভিহিত করেন। দেউলিয়া বিজেপি-র জাল চাণক্য তথা দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর শব্দভাণ্ডার দুর্বল হলেও হিংসার রাজনীতিতে তিনি পারদর্শী। তাই পোষ্য সাংবাদিকের তৈরি করা শব্দবন্ধকে আপন করে নিয়ে সমস্ত বিরোধীদের দেশদ্রোহী ও ‘টুকড়ে টুকড়ে গ্যাং’-এর সদস্য বলে গাল পাড়া বিজেপি-র নিত্যনৈমিত্তিক ইতরামোর অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়।

এক সাংবাদিক স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তথ্যের অধিকার আইনের ভিত্তিতে ভারতের গৃহমন্ত্রকের কাছে প্রশ্ন করেন যে এই ভয়াবহ ‘টুকড়ে টুকড়ে গ্যাং’ বলতে কাদের বোঝানো হচ্ছে? যেখানে স্বয়ং দেশের গৃহমন্ত্রী নিজে এই শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেছেন সেখানে গৃহমন্ত্রকের কাছে এই সংক্রান্ত বিশদ তথ্য থাকবে তা আশা করা অমূলক নয়। কিন্তু কী আশ্চর্যের বিষয়! গৃহমন্ত্রক ‘টুকড়ে টুকড়ে গ্যাং’ সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে দ্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছে এই সম্পর্কিত কোনো তথ্য তাদের কাছে নেই। অর্থাৎ, দেশের গৃহমন্ত্রক গৃহমন্ত্রীর ব্যবহৃত কথার কোনো ভিত্তি খুঁজে পায়নি। কারণ ‘টুকড়ে টুকড়ে গ্যাং’ বলে কোনো সমূহ ভারতে নেই। শব্দবন্ধটি শুধু সম্মিলিত মানুষের ন্যায্য দাবিগুলিকে দাবিয়ে দেওয়ার একটি অস্ত্র হিসেবেই ব্যবহার করেছে বিজেপি।

আমরা অবশ্য গৃহমন্ত্রকের এই উত্তরের সঙ্গে সহমত পোষণ করতে পারছি না। কারণ আমরা মনে করি দেশে একটি পরম শক্তিশালী এবং দুষ্ট ‘টুকড়ে টুকড়ে গ্যাং’ প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে যারা আমাদের চোখের সামনে ভারতকে খণ্ডবিখণ্ড করে দিতে চাইছে, মানুষে মানুষে বিভেদ আনতে চাইছে। এহেন একটি সংবিধান বিরোধী শক্তি ভারতে কাজ করে চলেছে কিন্তু গৃহমন্ত্রক তা জানতে পারছে না কারণ সেই শক্তিটিই বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার তথা গৃহমন্ত্রক পরিচালনা করে। শক্তিটির নাম মোদী-শাহ এবং বিজেপি।

২০১৯ সালের ৫ আগস্ট ভারতে জম্মু-কাশ্মীর বলে একটি রাজ্য ছিল যাকে ভেঙে দু টুকরো করে তাদের রাজ্যের মর্যাদা কেড়ে নিয়ে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করেছে মোদী-শাহ। কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিল করে সেখানকার মানুষের উপর অকথ্য অত্যাচার চালানো হয়েছে। মোবাইল-ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ, স্কুল-কলেজ বন্ধ, সরকারি প্রকল্পগুলি বন্ধ, দোকানপাট ব্যাবসা সমস্ত কিছু বন্ধ করে দেওয়া

হয়েছে কাশ্মীরে। সেখানকার নেতাদের বিনা বিচারে মাসের পর মাস জেলে বন্দী করে রাখা হয়েছে। বিগত প্রায় তিন দশক ধরে কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী উগ্রপন্থীরা যে কাজ করতে পারেনি, মোদী-শাহ তা করে দেখিয়েছে, তারা ভারতের মুকুটে যেই জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যটি অবস্থিত ছিল তা খণ্ড-বিখণ্ড করে দিয়েছে। সেখানকার মানুষের কাছে সম্পূর্ণরূপে ভারতের অত্যাচারী অসংবেদনশীল হিংস্র রূপটি তুলে ধরে তাদের ভারতের মূলধারার রাজনীতি থেকে আরো দূরে সরিয়ে দিয়েছে। উগ্র দেশপ্রেমের ধুয়ো তুলে কাশ্মীরের বাসিন্দা যারা আমার আপনার সহনাগরিক তাদের সমস্ত অধিকার ভেঙেচুরে তছনছ করে দিয়েছে মোদী-শাহ। তাই তারাই প্রকৃত 'টুকড়ে টুকড়ে গ্যাং'!

ভারতের মাটিতে বিভাজনের রাজনীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার সর্বশেষ ও সর্বাধিক ভয়াবহ নীতির নাম নাগরিকত্ব আইন এবং এনআরসি। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানকে কাঁচকলা দেখিয়ে ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে বিজেপি সরকার। তদুপরি বাংলাদেশ-পাকিস্তান-আফগানিস্তান থেকে আগত অ-মুসলমান বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাগরিকত্ব দেওয়া হলেও মুসলমানদের দেওয়া হবে না বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এর সঙ্গে এনআরসি যোগ হলে দেখা যাচ্ছে যে এনআরসি তালিকা থেকে অ-মুসলমানদের নাম বাদ গেলেও তারা ভারতের নাগরিকত্ব পেয়ে যাবেন নাগরিকত্ব আইন ২০১৯-র ফলে। কিন্তু মুসলমানদের নাম বাদ গেলে তাদের জন্য নাগরিকত্ব পাওয়ার কোনো সুযোগ রাখা হয়নি। সরাসরি মোদী-শাহ দেশের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে, সংবিধানকেই ভেঙে খানখান করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। তাই প্রকৃত 'টুকড়ে টুকড়ে গ্যাং' কারা তা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির দিকে তাকান। জেএনইউতে শাসকদল আশ্রিত গুন্ডাদের দাপাদাপি আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। আবার জামিয়া ও আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে উর্দি গায়ে রাষ্ট্রের পোষা গুন্ডাদের নির্মম আক্রমণ আমরা দেখেছি। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকরা আন্দোলনরত রয়েছেন। দেশের প্রায় সমস্ত প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়ে অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করা হয়েছে। আমাদের রাজ্যে বারবার যাদবপুর ও প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় বিজেপির আক্রমণের কেন্দ্রে রয়েছে। একই সঙ্গে লাগাতার শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দ কমিয়ে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকেই ধ্বংস করে দিতে চাইছে সরকার। বহু মানুষের অধ্যবসায়, পরিশ্রম, তিতিক্ষায় গড়ে ওঠা ভারতের বিজ্ঞান আজ পৃথিবীতে হাসির খোরাকে পরিণত। কারণ প্রধানমন্ত্রী সহ সরকার ও বিজেপি পার্টির বড়ো-মেজো-ছোটো নেতা সবাই বলে চলেছেন যে পৌরাণিক ভারতে প্লাস্টিক সার্জারি, বিমান, ইনটারনেট বা আণবিক বোমা প্রায় সবই আবিষ্কৃত হয়েছিল। ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থাকেও ধ্বংস করছে মোদী-শাহের 'টুকড়ে টুকড়ে গ্যাং'!

আমাদের দেশের অর্থব্যবস্থাকে কবরে পাঠানোর পাকা ব্যবস্থা করা হয়েছিল ৮ নভেম্বর ২০১৬ সালে নোট বাতিলের মাধ্যমে। তার ধাক্কা অর্থব্যবস্থা এখনও সামলে উঠতে পারেনি। বিগত বহু বছরের মধ্যে সর্বাধিক হয়েছে বেকারত্বের হার, বাড়ছে মূল্যবৃদ্ধি কমছে বৃদ্ধির হার। অথচ সরকারের কোনো চিন্তাই নেই। কারণ তাঁরা মনেই করেন না যে ভারতে কোনো আর্থিক সংকট ঘনীভূত হচ্ছে। ভারতের অর্থব্যবস্থাকে ধ্বংস করার কৃতিত্বও মোদী-শাহ জুটিকেই দিতে হবে কারণ অর্থমন্ত্রীকে বাজেট সংক্রান্ত আলোচনাতেও ডাকা হয়নি! সমস্ত কিছুই নিয়ন্ত্রণ করছে মোদী-শাহ!

আজ দেশের যেই প্রতিষ্ঠানগুলি গণতন্ত্র, সংবিধান ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে, প্রত্যেকটিকে দুর্বল করা হয়েছে। আরবিআই তার স্বাতন্ত্র্য হারিয়েছে, সিবিআই সরকারের খাঁচার পোষা ময়না, মোদী-শাহ যা বলে সিবিাই তাই করে। এমনকী নির্বাচন কমিশন ও সুপ্রিম কোর্টের ক্ষেত্রেও এই অভিযোগ উঠেছে। নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করার আগেই বিধানসভা নির্বাচনের তারিখ বলে দিচ্ছেন বিজেপি নেতা, একজন নির্বাচন কমিশনার বিজেপি তথা মোদী-শাহের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা বলে বিপদে পড়েছেন, তাঁকে নানাভাবে হেনস্থ করা হচ্ছে। অপরদিকে, সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারপতির সাংবাদিক সম্মেলন এবং তারপরে বাবরি মসজিদ-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলার রায়ে সুপ্রিম কোর্ট যেই অবস্থান গ্রহণ করেছে তাতে মানুষের মনে সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

সব মিলিয়ে তাই বলা যেতে পারে যে আর্থিক-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংবিধানিক যে-কোনো আঙ্গিকেই দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রের সমূহ ক্ষতি করেছে মোদী-শাহ সরকার। আমাদের দেশের সম্প্রীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতার ঐতিহ্য ও বহু বছরের লোকায়ত পরমতসহিষ্ণু সংস্কৃতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে আমাদের সংবিধানে। সেই সংবিধানকে ধ্বংস করতে চায় মোদী-শাহ। আমাদের দৃষ্টিতে তাই তারাই দেশের অকৃত্রিম 'টুকড়ে টুকড়ে গ্যাং'!

সমসাময়িক

লালায় বিষ

পুলিশ একবার যে-চারায় অল্পমাত্রও দাঁত বসাইয়াছে সে-চারায় কোনোকালে ফুলও ফোটেনা, ফলও ধরে না। উহার লালায় বিষ আছে।.... পুলিশের মারের তো কথাই নাই, তার স্পর্শই সাংঘাতিক। সখেদে লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পুলিশ সম্পর্কে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ডেপুটি ম্যাডিস্ট্রেট হিসেবে পুলিশের করা অভিযোগ বিশ্বাস করতেন না। এমনকী আদালত সম্পর্কেও তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ:

আদালতে বড়োলোকে পয়সা খরচ করিয়া তামাশা দেখিতে আসে। তলস্তয় 'রেজারেক্সন' উপন্যাসে আসামিদের চেয়েও যে বিচারকরা আরও খারাপ— তা জানাতে দ্বিধা বোধ করেননি। আজ আমাদের দেশ হয়ে উঠছে পুলিশ স্টেট— পুলিশ রাষ্ট্র। দক্ষিণ আফ্রিকার মতো। ১৯৪৮ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা প্রত্যক্ষ করেছে পুলিশি জুলুম, নজরদারি কাকে বলে। চিলির স্বৈরাচারী পিনোচেত সরকারের আমলে রাজনৈতিক আন্দোলন করা ছিল কঠিন। সরকারের বিরুদ্ধে কথা বললেই গণহারে জেলে ঢোকানো। ২০১৯-এর ৫ আগস্ট থেকে কাশ্মীর কার্যত এক মুক্ত কারাগার। প্রাক্তন তিন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লাহ, ওমর আবদুল্লাহ, মেহবুবা মুফতি আজও অন্তরীণ। ঘোষিতভাবে ৬৫০০ জন দেশের বিভিন্ন জেলে। পরিবারের মানুষদের সঙ্গে দেখা করার স্বাভাবিক ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকেও বঞ্চিত। কেন, কী কারণে তাঁদের গ্রেপ্তার কেউ জানেন না। প্রতিবাদ করতে এরা রাস্তায় নামেননি, রাস্তায় নামতে পারেন— এই ভয়ে ভীত মোদীশাহের সরকার এদের করেছে গ্রেপ্তার।

গুজরাটে পুলিশ নিপীড়ন এতদূর যে, প্যাটেল/পাতিদারদের সংরক্ষণের দাবিতে আন্দোলনে ১২০০০ (বারো হাজার) রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করা হয়েছে। আন্দোলনের মুখ তরুণ যুবক হার্দিক প্যাটেলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জামিনে ছাড়া পাওয়া মাত্র ২৩ জানুয়ারি জেল গেট থেকে আবার একটি মামলা দিয়ে ধরা হয়েছে। পূর্বপাকিস্তানে মুজিবুর রহমানের সঙ্গে এই আচরণই করত পুলিশ।

দলিত হত্যার ঘটনা ঘটেছে গত ছয় বছরে বত্রিশটির বেশি। একটিরও প্রতিকার হয়নি। নবরাত্রি দেখতে গিয়ে নিহত, ঘোড়ায় চড়ে বিয়ে করতে যাওয়ায় নিহত, কুয়োয় আগে জল নেওয়ায় নিহত, নলকূপের হাতল ধরেছে ছেলে তাই বাবাকে খুন— এরকম অজস্র ঘটনা। কোনো প্রতিকার নেই। বরং উলটে অভিযোগকারী/কারিণীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা ঠুকেছে পুলিশ।

বাংলাদেশে বলে, মাছের রাজা ইলিশ/দেশের রাজা পুলিশ, পশ্চিমবঙ্গে প্রবাদ— বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা/পুলিশে ছুলে ছাপান্ন ঘা।

ঘা তো শুকোচ্ছেই না দেশে। দিল্লিতে জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের ওপর নৃশংস আক্রমণ চালায় কেন্দ্রীয় সরকারের পুলিশ বাহিনী, প্রথমে ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯, পরে ১৫ ডিসেম্বর পুলিশ চড়াও হয় জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। অসাংবিধানিক বৈষম্যমূলক ক্যা আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন। পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক ভেঙে ক্যাম্পাসে ঢোকে। গ্রন্থাগারে ঢুকে ছাত্রছাত্রীদের নির্বিচারে পেটান। এমনকী শৌচাগারে লুকিয়ে পড়েও রেহাই মেলে না।

এতদিন জানা ছিল, পুলিশ দাঙ্গার সময়, অস্ত্র ধার দেয়। বা পাহারা দিয়ে রক্ষা করে আক্রমণকারীদের। অমিত শাহের আমলে উর্দি ধার দিল। আইপিএস অফিসারের পোশাকেও দেখা দিলেন আরএসএসের কর্মী। এই ঘটনার মোড় ঘুরিয়ে দিল্লি পুলিশের সদর দপ্তর ঘেরাও করে জামিয়ার সঙ্গে জওহরলাল নেহেরু ও দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। সারা দেশের ছাত্রছাত্রীরা রুখে দাঁড়ান। নজিরবিহীনভাবে পথে নামেন আইআইটি, আইআইএমের ছাত্রছাত্রীরা, গবেষক গবেষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকারাও। এর পরদিন থেকে শুরু হয় শাহিনবাগ আন্দোলন। অত্যাচার যখন চরমে প্রতিরোধও তখন তীব্র হয়। ইতিহাসের শিক্ষা এটাই।

শাহিনবাগে মহিলারা দলে দলে এসে রাতদিন একাকার

করে অবস্থান করছেন। শাহিনবাগের অনুপ্রেরণায় দেশে ছড়িয়ে পড়ছে অজস্র শাহিনবাগ। পশ্চিমবঙ্গেই তিনটি— ৭ জানুয়ারি থেকে পার্ক সার্কাসে, ২১ জানুয়ারি থেকে কলকাতার নিউ মার্কেট ও বহরমপুরে। শুরু হয়েছে আলিগড়, লক্ষ্ণৌয়ের ঘণ্টাঘরে। প্রতিদিন কোথাও না কোথাও শাহিনবাগ জন্ম নিচ্ছে।

উত্তরপ্রদেশের পুলিশের অত্যাচার সীমাহীন। সম্পন্ন মুসলিমদের ঘরে ঘরে ঢুকে ভাঙচুর চালিয়েছে। দোকান ও বাড়ি লুঠ করেছে। নিজেরা গাড়ি পুড়িয়েছে। ভেঙেছে। আবার মিথ্যা মামলাও করেছে। সম্পত্তি ভাঙচুরের 'অপরাধে' ৭০ লাখ জরিমানার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। ১৫০ জন বিধায়ক উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী অজয় কুমার বিস্টের বিরুদ্ধে অবস্থান করায় নজর ঘোরাতে তীব্র পুলিশি অত্যাচার। লক্ষ্ণৌয়ের ঘণ্টাঘরের প্রতিবাদকারিণীদের লাঠি চালিয়ে হঠানো যায়নি। তখন বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে পুলিশ। ২৫ জানুয়ারি 'দি টেলিগ্রাফে' প্রথম পাতায় একটি অসামান্য প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবাদকারিণীকে থামাতে স্বামীর কাছে হাজির পুলিশ।

মানা করুন। যাতে না যায়।

কথা শুনছে কে?

জোর খাটান।

তিন তালাক দিলে আপনারাই তো আমাকে জেলে পুরবেন।

এই ঘটনা জানিয়ে মহিলা বলেছেন, দেশে গণতন্ত্র চাই। পরিবারে গণতন্ত্র আছে। স্বামী রাজনীতি নিয়ে বাড়িতে আলোচনাই করেন না। তবু আমি জানি, আমার কী করা উচিত।

আমাদের খবর আর তেমন বাইরে আসছে না। নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মেঘালয়ের খবর তেমন বাইরে আসছে না। গোটা দেশটাই আজ কাশ্মীর।

রবীন্দ্রনাথ 'ডাকঘর' নাটক সম্পর্কে লিখেছিলেন, গোটা দেশটাই আজ জেলখানা।

ভারত এখন সম্প্রসারিত জেলখানা। বিরোধী হলেই মিথ্যা মামলা, ভয় দেখানো সর্বত্র।

তার মাঝে খবর এসেছে কাশ্মীরের এক ডেপুটি পুলিশের ডেপুটি সুপার দেবেন্দ্র সিংয়ের। ২০০১-এ সংসদে হামলায় অভিযুক্ত আফজলগুরু দাবি করে দেবেন্দ্র সিং তাকে এক জঙ্গিকে আশ্রয় ও গাড়ি দিতে বাধ্য করেছিলেন। ২০০৮-এর ডিসেম্বরে মুস্তাফ আহমেদ নামে কাশ্মীর পুলিশের কনস্টেবল জানান, তিনি কলকাতা থেকে ২২টি সিম কিনে দেন দেবেন্দ্র ও এসএম সহায়কে, কোনো তদন্ত হয়নি। শাস্তি তো দূরস্থান। পুলওয়ামা হামলার সময় দায়িত্বে ছিলেন দেবেন্দ্র সিং।

পুলওয়ামায় বিয়াল্লিশজন জওয়ান প্রাণ হারালেন। কারা বিস্ফোরক কোন পথে কীভাবে নিয়ে এল— তার কোনো তদন্ত হয়নি।

কেন হয়নি— বোঝাই যাচ্ছে।

সর্ষের মধ্যেই ভূত।

দেবেন্দ্র এক বিজেপি নেতার জামাই। গ্রেপ্তার হওয়ার সময় দেবেন্দ্র সিং বলে—

এটা একটা গেম।

গেম খারাপ করে দিয়ো না।

গেম একটাই— দিল্লি ভোটের আগে প্রজাতন্ত্র দিবসে হামলা চালানো দুই তথাকথিত জঙ্গিকে দিয়ে।

জঙ্গি সাজা নাভিদ— কাশ্মীরের পুলিশ অফিসার। কাশ্মীরের আপেল বাগানে পাঁচ জন বাঙালি শ্রমিককে গুলি চালিয়ে হত্যা করেছিল।

পুলিশ বাক্সে সাজানো ঘটনা আরো কত ঘটে সেটাই দেখার।

বিরোধী ঐক্যে ফাটল

নাগরিকত্ব আইন এবং এনআরসি নিয়ে বিজেপি যতটা ঐক্যবদ্ধ, তার বিপ্রতীপে বিরোধী শিবিরের ছত্রভঙ্গ চেহারাটা চোখে লাগার মতো। সোনিয়া গান্ধির ডাকা এনআরসি এবং সিএএ বিরোধী বৈঠকে অনুপস্থিত থাকল ছয়টি উল্লেখযোগ্য বিরোধী দল। তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি সোনিয়ার ডাকা ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন না। অনুপস্থিত থাকলেন তৃণমূলের পাশাপাশি, সমাজবাদী পার্টি, বহুজন সমাজ পার্টি, আম আদমি পার্টি, ডিএমকে, এবং শিব সেনার প্রতিনিধিরাও। সব মিলিয়ে মোট কুড়িটি দল বৈঠকে হাজির হলেও এদের অধিকাংশই ছোটো এবং আঞ্চলিক দল।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন তিনি সোনিয়া গান্ধির ডাকা বৈঠকে যাবেন না কারণ বন্‌ধের নামে বাংলায় তাণ্ডব চালিয়েছে বামেরা। কংগ্রেসও সামিল তাদের সমর্থনে। তাই

সোনিয়ার ডাকা বৈঠকে তাঁর দলের কোনো প্রতিনিধিও তিনি পাঠাবেন না বলে জানান। অন্য দলগুলো কেন আসেনি, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছে তারা। আপ জানিয়েছে, তাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। ডিএমকের দাবি, স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের আচরণে তারা ক্ষুণ্ণ। রাজস্থানে মায়াবতীর দল ভাঙিয়ে নিয়েছে কংগ্রেস। এইসব অভিযোগ আছে। তেমনই মহারাষ্ট্রে শিবসেনারও অভিযোগ রয়েছে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। অভিযোগ রয়েছে সপারও। উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি ছিল শারদ পাওয়ার, শরদ যাদব, সীতারাম ইয়েচুরি, ডি রাজা, হেমন্ত সোরেন-সহ উনিশটি দলের প্রতিনিধিরা। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিরোধী শিবিরে এই ফাটল বিজেপির পক্ষে সুখবর, সন্দেহ নেই।

কিন্তু বিভিন্ন দলের না আসাটা যেমন বিরোধী ঐক্যের পক্ষে খারাপ, ঠিক তেমনই সমস্যাজনক কংগ্রেসের অবস্থানও। কংগ্রেসের দ্বিচারিতার দায় তো অন্য বিরোধী দলগুলি নিতে পারে না, তাই এর উত্তর কংগ্রেসকেই দিতে হবে। কংগ্রেস শাসিত চার রাজ্য রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং পণ্ডিচেরি কেন এনপিআর করবার প্রস্তাবে না বলেনি? পঞ্জাব কিন্তু ঘোষণা করে দিয়েছে যে তারা এনপিআর করবে না। এদিকে কংগ্রেস সর্বভারতীয় স্তরে গিয়ে মুখে নাগরিকত্ব আইনের বিরোধীতা আর অন্যদিকে তাদের রাজ্যগুলি এনপিআরের কাজ চালিয়ে যাবে, এমন দ্বিচারিতা কেন? কংগ্রেস শাসিত রাজ্য সরকারগুলি ইতিমধ্যেই এনপিআর চালুর ব্যাপারে মৌখিক আপত্তিও জানিয়েছে। তা হলে কেন জানুয়ারির মাঝামাঝি দিল্লিতে কেন্দ্র আহুত এনপিআর বৈঠকে কংগ্রেস শাসিত রাজ্যগুলির আধিকারিকরা অংশ নিলেন? কেরল তো এই অবস্থানে সবথেকে বেশি স্বচ্ছ। তারা ইতিমধ্যেই দেশের প্রথম রাজ্য হিসেবে বিধানসভায় নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ করিয়েছে। এই দৃঢ়তা কংগ্রেস দেখাতে পারছে না কেন? রাজস্থান ও পাঞ্জাবের মতো মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ে ক্যা বিরোধী প্রস্তাব কেন পাশ করাচ্ছে না, কংগ্রেস? আবার কংগ্রেস নেতা কপিল সিবাল মন্তব্য করেছেন যে সংসদে পাশ হওয়া কোনো আইন না মানা কোনো রাজ্য সরকারের পক্ষে সহজ নয়। সলমন খুরশিদও বলেছেন যে সিএএ হবেই। কংগ্রেস নিজেই দ্বিধাবিভক্ত, তারা এই আইনের সমর্থন করবে না বিরোধীতা। কাজেই এই দ্বিচারিতা ও দ্বিধার মেঘে ঢাকা একটি দল কীভাবে বিজেপি বিরোধী লড়াইতে নেতৃত্ব দেবে, সেটা বলা কঠিন।

এরপর আসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ, দ্বিচারিতায় যিনি কংগ্রেসের কয়েক কাঠি উপর দিয়ে যাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করতে তাঁর রাজনৈতিক সত্তায় আঘাত লাগে না, কিন্তু সংগ্রেসের বৈঠক তিনি এড়িয়ে যান বন্‌ধে বামেদের হিংসার মতো তুচ্ছ অভিযোগ দেখিয়ে। যারা ধর্মঘট ডেকেছে, তাদের উপর তিনি বিরূপ হতেই পারেন। প্রয়োজনে বিশৃঙ্খলার কারিগরদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থাও করতে পারেন। কিন্তু তার জন্য জাতীয় স্তরের বৈঠক থেকে সরে আসা কেন? আসল কারণটা কী? মোদিকে খুশি রাখা, যাতে কেন্দ্র তাঁর পেছনে সিবিআই না লেলিয়ে দেয়? অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজীব কুমারকে না ঘাঁটায়? প্রসঙ্গ তৃণমূলই একমাত্র বিরোধী দল যারা গত ৮ জানুয়ারির বিজেপি-বিরোধী ধর্মঘটকে সমর্থন করেনি। নরেন্দ্র মোদী কলকাতায় আসার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছুটে গিয়েছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। যেভাবে মমতা বিরোধী ঐক্যে অন্তর্ঘাত করলেন, তার বিনিময়মূল্যটা কী ছিল, সেটা জানার আগ্রহ আছে আমাদের। বন্ধ দরজার পেছনে কোন বোঝাপড়ার ফলশ্রুতিতে বিজেপি এতটা সুবিধে পেয়ে যাচ্ছে, আর এদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে লিপ সার্ভিস দিয়েই কাজ সারছেন, সেটা এবার লোকসমক্ষে আসার সময় হয়েছে।

একই অবস্থা অরবিন্দ কেজরিওয়াল অথবা মায়াবতীরও। নিজের দলকে বিজেপি-র বি-টিম বানিয়ে দিয়েছেন, এমন অভিযোগ মায়াবতীকে আগেই শুনতে হয়েছে। এই বৈঠকে না আসা সেই অভিযোগে আরো সারজল দিল। কেজরিওয়ালও ক্ষুদ্র রাজনীতির স্বার্থেই সম্ভবত বৃহৎ রাজনীতিকে বলি দিলেন। শিবসেনা এখনও সম্ভবত তাদের বিজেপি-প্রেম কাটিয়ে উঠতে পারেনি, তাই জাতীয় স্তরে নানা ইস্যুতেই বিরোধী দলগুলির সঙ্গে এক মঞ্চে না এসে বিজেপিরই সুবিধে করে দিচ্ছে। এই জাতীয় এবং আঞ্চলিক দলগুলির ক্ষুদ্র স্বার্থ এবং সুবিধাবাদী রাজনীতিতে আসলে ক্ষতি হচ্ছে নাগরিকত্ব আইন বিরোধী আন্দোলনেরই, যেটা কেউই অনুধাবন করবার জায়গাতে নেই।

যেটা উল্লেখযোগ্য, সাধারণ মানুষও আর এই দলগুলির মুখাপেক্ষী হয়ে বসে নেই। তাঁরা নিজেদের মতো করে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। মহিলা এবং ছাত্রদের নেতৃত্বে এই লড়াই এখন এমন মাত্রায় চলে গেছে যে নরেন্দ্র মোদীকে কলকাতায় অভ্যর্থনা করবার পর খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কলকাতার মাটিতে দাঁড়িয়ে শুনতে হয়েছে 'মমতা গো ব্যাক'। ভবিষ্যতে যদি এই দলগুলি তাদের নিজস্ব স্বার্থের উপরে উঠে জাতীয় স্তরে ঐক্যবদ্ধ না হতে পারে, সাধারণ মানুষই তাদের আবর্জনার মতো ছুঁড়ে ফেলবেন। কারণ এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের বুকে দলীয় রাজনীতির থেকে অনেক বড়ো হয়ে উঠেছে অস্তিত্ব রক্ষার রাজনীতি, যা কোনো ভোটের হিসেব-নিকেশের তোয়াক্কা করে না। কংগ্রেস হোক বা তৃণমূল অথবা আম-আদমি পার্টি, যারাই গণবিক্ষোভের এই অন্তর্গত মনস্তত্ত্ব বুঝতে অক্ষম

হবে, তারাই পরিত্যক্ত হবে ইতিহাসের বিচারে। ভোট আসবে যাবে, কিন্তু ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে বাস মিস করলে সেটা আর ফিরে আসবে না। কাজেই, জনগণের সংগ্রামে নায়কোচিত নেতৃত্ব না কি ভোটের অঙ্কের খাতায় ভীরুর মতো আত্মসমর্পণ, কোন রাস্তা বেছে নেবে বিরোধী দলগুলি, সেটাই ঠিক করে দেবে ইতিহাসে তাদের অবস্থান।

সুপ্রিম কোর্টের দীর্ঘসূত্রিতা

ইংরেজিতে একটি লজ্জ চালু আছে— 'জাস্টিস ডিলেইড ইস জাস্টিস ডিনায়েড'। মানে ন্যায়বিচারের প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রিতার অর্থ হল ন্যায় থেকে জনসাধারণকে বঞ্চিত করা। এই মুহূর্তে সুপ্রিম কোর্টের আচরণ দেখে এই চালু কথাটিই আবার যেন মনে পড়ে যায়। যে কোর্ট রামমন্দির সমস্যা সমাধানের জন্য এত ব্যাগ্র হয়ে উঠেছিল, তারাই কাশ্মীরের লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের দুর্দশা নিয়ে উচ্চবাচ্য করছে না বিশেষ। যেন রামমন্দির তৈরির ইস্যুটি অবরুদ্ধ উপত্যকার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আবার এই সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ই বিতর্কিত নাগরিকত্ব আইনের উপর কোনো স্থগিতাদেশ দিল না। ২২-শে জানুয়ারির রায়ে সুপ্রিম কোর্ট জানাল যে যদিও এনআরসি-ক্যা-এনপিআর জ্বলন্ত বিষয়, এবং সাধারণ নাগরিকদের ক্ষোভের বিষয়টিকেও তারা মেনে নিয়েছে, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্য শোনার আগে অবধি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তারা নিতে চায় না। এই অবস্থায় জটিলতা আরো একটু বেড়ে গেল, এবং ঝুলে থাকল নাগরিকত্ব ইস্যু নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্নের উত্তরও।

প্রধান বিচারপতি শরদ অরবিন্দ বোবডে স্বীকার করেছেন যে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন সকলের মনেরই একেবারে উপরে রয়েছে, কিন্তু স্থগিতাদেশ দিতে রাজি হননি। সিএএ-র পাশাপাশি জাতীয় জনগণনা পঞ্জির (এনপিআর) কাজ বন্ধ রাখার দাবিও আজ মানেনি সুপ্রিম কোর্ট। একাধিক আইনজীবীর অভিযোগ ছিল, এনপিআরের তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে, ধর্মের ভিত্তিতে 'বেআইনি অনুপ্রবেশকারী' বা 'সন্দেহভাজন নাগরিক'-দের চিহ্নিত করার কাজ হবে। তাই এই প্রক্রিয়া বন্ধ রাখা হোক। কিন্তু প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চ এই আবেদনে সাড়া দেয়নি। প্রধান বিচারপতি অবশ্য ইঙ্গিত দিয়েছেন যে শেষ পর্যন্ত সাংবিধানিক বেঞ্চেই সিএএ সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি করতে হবে। এইসব মামলারই মূল প্রতিপাদ্য হল, সিএএ সংবিধানের বিরোধী। কারণ, এতে নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রশ্নে ধর্মের ভিত্তিতে ভেদাভেদ করা হচ্ছে।

সিএএ-র পক্ষে-বিপক্ষে সুপ্রিম কোর্টে ১৪৪টি আবেদন জমা পড়েছে। কেন্দ্র সব আবেদনের জবাব দিয়ে উঠতে পারেনি। এজন্য সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রকে চার সপ্তাহ সময় দিয়েছে। কেন্দ্রের আর্জি, আর কোনো মামলা যেন গৃহীত না হয়। কেন্দ্র জবাব দেওয়ার পরে, ফেব্রুয়ারির শেষে বা মার্চের গোড়ায় শুনানি শুরু হতে পারে। সাংবিধানিক বেঞ্চে মামলা পাঠানো, শুনানির দিনক্ষণ, অন্তর্বর্তী রায়ের বিষয়ে তখনই সিদ্ধান্ত হবে। সুপ্রিম কোর্ট নাগরিকত্ব আইন নিয়ে দায়ের হওয়া মামলার আর্জির ভিত্তিতে তাকে বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করে দিয়েছে। সেই ভিত্তিতে অসম, উত্তর-পূর্ব ভারতের ইস্যুগুলি নিয়ে আলাদা করে শুনানি হবে। উত্তরপ্রদেশে ইতিমধ্যেই নাগরিকত্ব আইন লাগু করার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। তাই সেই ইস্যু নিয়ে দায়ের হওয়া মামলার শুনানি আলাদা করে হবে। আদালত দায়ের হওয়া সমস্ত মামলার তালিকা জোন অনুযায়ী চেয়ে পাঠিয়েছে এবং সেই হিসাবেই কেন্দ্রের কাছে জবাব চেয়ে নোটিশ জারি করা হয়েছে। শীর্ষ আদালত এটাও জানিয়েছে যে দেশের বাকি রাজ্যের হাইকোর্টে নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলায় কোনো নির্দেশ দেওয়া যাবে না এবং কেন্দ্র সরকারের আর্জি অনুযায়ী ওই সমস্ত মামলা সুপ্রিম কোর্টে ট্রান্সফার করতে হবে।

এদিকে কেন্দ্রের ঘোষণা অনুসারে, এপ্রিল থেকে এনপিআরের তথ্য সংগ্রহ শুরু হবে। সেই তথ্য ভবিষ্যতে দেশ জুড়ে এনআরসি-তে কাজে লাগানো হবে। পাকিস্তান-বাংলাদেশ-আফগানিস্তান থেকে আসা মানুষের মধ্যে মুসলিম ছাড়া বাকি ধর্মাবলম্বীদের সিএএ-র মাধ্যমে নাগরিকত্ব দিয়ে, এনপিআর, এনআরসি-র মাধ্যমে বেআইনি নাগরিক চিহ্নিত করা হবে। এর মধ্যে উত্তরপ্রদেশ সরকার দুসপ্তাহ আগেই বহু মানুষকে সন্দেহভাজন নাগরিক বলে চিহ্নিত করে ফেলেছে। সিএএ-তে নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে অন্তত দুসপ্তাহের জন্য সিএএ এবং এনপিআরের প্রক্রিয়া পিছিয়ে দেবার আর্জি ছিল। কিন্তু কেন্দ্র যে-কোনো মতেই পিছিয়ে আসতে রাজি নয়, সেটা অ্যাটর্নি জেনারেল কে কে বেণুগোপালের বক্তব্যেই স্পষ্ট। বেণুগোপাল বলেছেন যে পিছিয়ে দেওয়া আর স্থগিতাদেশ দেওয়া আদতে একই ব্যাপার এবং কোনোমতেই কেন্দ্র তা করতে রাজি নয়।

অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর এখনও মিলছে না, এবং সুপ্রিম

কোর্ট বা কেন্দ্র কেউই সেগুলোর জবাব দিচ্ছে না। প্রথম প্রশ্ন, সিএএ-তে নাগরিকত্বের শংসাপত্র দেবার পর, সুপ্রিম কোর্ট যদি সিএএ খারিজ করে দেয়, সেই নাগরিকত্ব থাকবে, না কি খারিজ হবে? খারিজ না হলে, অননুমোদিত বিলের উপর নির্ভর করে দেওয়া নাগরিকত্ব কি সংবিধানবিরোধী হবে না? আর যদি খারিজ হয়, তা হলে তার প্রক্রিয়াটি কী? সেটার আবেদন করতে গেলে কি আবার নতুন করে আরেকটি নাগরিকত্ব বিল আনা হবে? দ্বিতীয় প্রশ্ন, নরেন্দ্র মোদী বা অমিত শাহ অসমে এন আর সির চূড়ান্ত তালিকা ঘোষণার পরে একবারের জন্যও নাগরিক সংশোধনী আইনের কথা বলে সেখানকার চোদ্দ লক্ষ হিন্দু 'শরণার্থী'-কে কেন মানসিক নিরাপত্তা দিচ্ছেন না? এই প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ওই শরণার্থীদের উচ্ছেদ হবার প্রসঙ্গ। বিজেপির কেন্দ্রীয় সরকারের আশ্বাস মতন যদি অসমের মাটিতে শুধুমাত্র সেখানকার ভূমি পুত্রদের অধিকার সংরক্ষিত থাকে তা হলে ওই চোদ্দ লক্ষ মানুষ সিএএ-র দ্বারা যখন ভারতীয় নাগরিকত্ব পাবেন তখন তাঁরা কোথায় যাবেন? অসমে তাঁদের বর্তমান ভিটেমাটির কী হবে? আবার এই প্রসঙ্গেই একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু উঠে আসে, তা হল বৈধতার প্রশ্ন। যে নাগরিকেরা একটা সরকারকে নির্বাচিত করলেন নিজেদের ভোটে, এখন সেই নাগরিকেরাই যদি অবৈধ ঘোষিত হয়ে যান, তা হলে তাঁদের দ্বারা নির্বাচিত সরকার কীভাবে বৈধ হয়? এবং এই নির্বাচনটা হয়েছে সরকারেরই দেওয়া পরিচয়পত্র দেখিয়ে, মানে ভোটার কার্ড। এখন সেই ভোটার কার্ডও নাগরিকত্বের যথেষ্ট প্রমাণ হিসেবে যদি বিবেচ্য না হয়, তা হলে আগের নির্বাচন এবং সরকার গঠনের প্রক্রিয়াটিকেও তো বাতিল করে দিতেই হয়! আবার তথ্য-অধিকার আইনে এটাও আমাদের জানার অধিকার আছে যে অসমের এই যে উনিশ লক্ষ অনাগরিক, চোদ্দ লক্ষ হিন্দু এবং পাঁচ লক্ষ অন্যান্য ধর্মের, তাঁদেরকে যেসব সরকারি দপ্তর এবং জনপ্রতিনিধিরা রেশন কার্ড, ভোটার আই কার্ড, আধার কার্ডসহ অন্যান্য পরিচয়পত্র দিতে সাহায্য করেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে?

একটা প্রশ্নের উত্তরও কেন্দ্র অথবা কোর্ট দিচ্ছে না। বিজেপি সরকারের মন্ত্রীরা বলছেন পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান থেকে আগত হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পারসি, খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী শরণার্থীদের সিএএ আইনের মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য কোনো তথ্য প্রমাণ দিতে হবে না। কিন্তু তা হলে কীভাবে প্রমাণ হবে আবেদনকারী এই শরণার্থীরা এই তিনটে দেশ থেকেই এসেছেন, তার কোনো সদুত্তরও এখনও মেলেনি। আবার কোন হিসেবে শ্রীলঙ্কা অথবা মায়ানমারের অত্যাচারিত হিন্দুরা এই আইনে নাগরিকত্ব পাচ্ছেন না, সেটাও ধোঁয়াশায়। এই দেশগুলিতে মুসলমানদের সরাসরি অপরাধী হিসেবে প্রমাণ করা যাচ্ছে না বলেই কি এদের বাইরে রাখা হল? এই এত এত রহস্যের উত্তর না মেলা অবধি, অথবা কেন্দ্র সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না দেওয়া পর্যন্ত কেন নাগরিকত্ব আইন স্থগিত রাখা হল না? কেন্দ্রের দায় আছে বুঝি, কারণ বিজেপি-র নিজস্ব রাজনৈতিক হিসেবনিকেশ থাকতে পারে, কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট তো কোনো রাজনীতির তাড়না থেকে চালিত হতে পারে না। তা হলে কোর্ট এরকম অদ্ভুত রায় কেন দিল?

আরো যেটা অদ্ভুত, সংকট বাঁচিয়ে রাখার এই প্রবণতা কিন্তু রামমন্দির রায়ের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। সেখানে কোর্ট চল্লিশ দিন টানা শুনানি চালিয়ে কেন্দ্রের পছন্দমতো রায় দিয়েছে যাতে ব্যাপারটার তথাকথিত দ্রুত নিষ্পত্তি হয়ে যায়। এর থেকেও আশ্চর্যের ব্যাপার হল, সাধারণ মানুষের বিভ্রান্তি কাটাতে সিএএ-র উদ্দেশ্য সম্পর্কে যথেষ্ট প্রচার করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে পরামর্শ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি। তার মানে তো কোর্ট একপ্রকার মেনেই নিচ্ছে যে এই আইন নিয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই, যা কিছু সমস্যা সেটা এর প্রচারে। ভারতে নাগরিকত্ব অর্জন বা অস্বীকার করার জন্য ধর্ম কোনো কারণ হতে পারে, সেটা তো তা হলে বিচারের আগেই মেনে নেওয়া হচ্ছে। সাম্যের অধিকার, মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করে, ধর্মের ভিত্তিতে অবৈধ অভিবাসীদের একটি অংশকে নাগরিকত্ব প্রদান করার প্রক্রিয়াটিকে কি তা হলে কোর্ট বৈধতা দিয়েই দিল?

এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আদালতকেই দিতে হবে। যে আইনের বলে দেশের লক্ষ লক্ষ নাগরিক ভিটেমাটি এবং পরিচয় হারাতে চলেছেন, তাকে বিনা প্রশ্নে এবং ভাসা ভাসা প্রতিশ্রুতির দাবিতে কিছুতেই অনুমোদন দিতে পারে না আদালত, সেটা ন্যায্য অথবা বৈধ, কোনোটাই নয়। সাংবিধানিক বেঞ্চে এই প্রশ্নের ফয়সালা হবে কি না, সেটা সময় বলবে। কিন্তু তার বাইরেও এই প্রশ্নগুলোর উত্তর চেয়ে গণআন্দোলন তীব্র করা জরুরি। মনে রাখতে হবে, আদালত পবিত্র হতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর নয়। সেটাও জনগণের দ্বারাই তৈরি, এবং মানুষকে ন্যায় দেবার জন্যই তার ব্যবহার। সেই ন্যায়ের ধারণা যদি রাজনৈতিক হিসেবনিকেশ অথবা সরকারি চাপের মাধ্যমে কলুষিত হয়, তা হলে তার স্বচ্ছকরণের জন্যও এগিয়ে আসতে হবে দলমতনির্বিশেষে সাধারণ মানুষকেই।

মাতৃত্ব যখন প্রতিরোধের ভাষা

সুপর্ণা ব্যানার্জি

'কী আর করব? বাচ্চারা অভুক্ত থাকছে দেখে আর কতদিন নিশ্চুপ থাকব? আমরা তো মা! এই পরিস্থিতি কি সহ্য করা যায় নাকি?' এই বক্তব্য পুষ্পার, কালচিনি চা-বাগানে কর্মরতা এক আদিবাসী মহিলা শ্রমিকের। তখন ২০১০ সাল। কালচিনি চা-বাগানের শ্রমিকেরা আঞ্চলিক প্রশাসনের বন্ধ শিল্পের শ্রমিকদের ভাতা (Financial Assistance to Workers in Locked Out Industries (FAWLOI) সময়মতো না দেওয়ার প্রতিবাদে, রেল রাস্তা আটকে বসে ছিলেন। প্রায় দশ বছর পরে, প্রায় একই আবেগ শাহীনবাগের নূরজাহানের কথায় আমাদের কানে ভেসে আসে, 'এই শীতে, কেন বসে আছি এখানে? পায়ের নীচের জমি আর মাথার ওপর ছাতের হক বুঝব বলে। আমার চুল্লির আগুন, আমার আকাশ, আমার বাতাস আর আমার সন্তানদের ভবিষ্যতের হক বুঝব বলে'।

সিএএ, এনআরসি, এনপিআর বিরোধী আন্দোলনে মহিলারা কীভাবে নেতৃত্ব ভূমিকা পালন করেছেন, তা নিয়ে ইতিমধ্যে অনেকে লিখেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন। আমি যা বুঝতে চাইছি তা হল কীভাবে আন্দোলনের এই চূড়ান্ত মুহূর্তে, 'মাতৃত্ব' প্রতিবাদের কারণ এবং অন্যদিকে রূপ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। আমাদের দেশে, মহিলারা, মূলত যারা মুসলমান, দলিত বা আদিবাসী, তাদের সমাজে চিরকাল অদৃশ্য এবং সবথেকে প্রান্তিক হিসেবে রাখা হয়েছে। কোনোদিনই যাদের গলার আওয়াজ দেশের মূলধারার রাজনীতি শুনতে পায়নি, আজ এই আন্দোলনে, তাদের কণ্ঠস্বরের সম্মিলিত গর্জনেই প্রতিরোধ ত্বরান্বিত হচ্ছে, পিতৃত্ববাদ পিছু হঠছে। উল্লেখযোগ্যভাবে এই গর্জনের যে ভাষ্য, তা মাতৃত্বের। ভারতবর্ষের মতন দেশে, হিন্দু উচ্চবর্ণের সংস্কৃতি, মাতৃত্বকে পূজনীয় করে, তাকে অন্দরমহলে সীমাবদ্ধ রেখেছে। সেই প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে, মুসলিম, দলিত, বা আদিবাসী মহিলারা, পুর্বোক্ত ভাষ্যের উলটোদিকে দাঁড়িয়ে মাতৃত্বকে প্রতিরোধের হাতিয়ার হিসেবে যেভাবে তুলে এনেছেন তার গুরুত্ব অপরিসীম ও অভাবনীয়। এমন প্রতিরোধের কথা তাঁরা বলছেন যা শুধু তাঁদের সন্তানদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত করতে চাইছে তা নয়, পাশাপাশি মনুষ্যত্ব ও নাগরিকত্বের অধিকারকেও রক্ষা করতে চাইছে।

জুডিত বাটলার বলেছিলেন যে রাজনীতি যদি হয় শুধুমাত্র বিশ্বজনীন ও সমানাধিকারের সংজ্ঞার ওপর বিস্তৃত তবে তার ভাষা জাতি বা লিঙ্গ বৈষম্যকে কখনোই তার পরিসরে আনতে পারে না। এযাবৎকাল পর্যন্ত যে মহিলারা মূলধারার আন্দোলনের কাছে অদৃশ্য ছিল, তাঁরা তাঁদের মাতৃত্বকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে অবলম্বন করে উপস্থিত হয়েছেন, বলা ভালো রীতিমতো তেজের সঙ্গে তাঁদের উপস্থিতির জানান দিচ্ছেন। উচ্চবর্ণের অন্দরমহল থেকে, পরিবার ও মাতৃত্বকে এক ধাক্কায়, সাধারণের, রাজনীতির রাজপথে এনে দাঁড় করিয়েছেন। এই আন্দোলনগুলি দেখাচ্ছে যে মাতৃত্ববোধ আর শুধু সন্তানের প্রতি ভালোবাসায় সীমাবদ্ধ নেই, নাগরিকত্বের দাবিতে তা এখন রাজনৈতিক ও সংগ্রামী অস্ত্র। মাতৃত্ব এখন একটি জোরালো কণ্ঠস্বর যা মূলধারার রাজনৈতিক ভাষ্যই একমাত্র ভাষ্য কিনা তাকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে। যে রাজনীতি তাঁদের আশা আশঙ্কাকে প্রান্তিক ও আদিম খেতাব দিয়ে অস্বীকার করে।

মাতৃত্বের এই বিশেষত্ব আন্দোলনের একটি বিশেষ অভিমুখের কারণে আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এনআরসি, সিএএ-র বাকি সমস্ত সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে সিএএ ভারতের পরিবার ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও ভয়ংকর বিপদজনক বিশেষ করে গরিব পরিবারগুলির জন্য। এনডিটিভিতে, আসমা খাতুন নামক এক নব্বই বছরের প্রৌঢ়া বলেছিলেন, তিনি তাঁর পরিবারের সাত পুরুষ সম্পর্কে সব বলতে পারেন, কিন্তু কাগজ তিনি কোথায় পাবেন? এই কাগজ দেখাতে অপারগ পরিবারগুলি, দলিত, মুসলমান বা আদিবাসী, যে কেউ হতে পারে কিন্তু নিশ্চিত ভাবে তারা গরিব। দীর্ঘদিন তারা সমাজের চোখে অদৃশ্য ছিল কিন্তু এই আন্দোলন তাদের মূল প্রতিবাদী স্রোতের কেন্দ্রবিন্দু করে তুলেছে। এই মহিলারা নিজেদের পরিবারের

ত্রাতা রূপে রাস্তায় নেমেছেন। পরিবারের সদস্যদের নাগরিকত্ব অধিকার রক্ষা করতে তো অবশ্যই এ লড়াই তাঁরা লড়ছেন, কিন্তু পাশাপাশি নিজেদের, অহিন্দু, নিম্নবর্ণের পূর্বপ্রজন্মের ভারতীয়ত্ব রক্ষাও তাঁরা করছেন। করতে তাঁরা বাধ্য কারণ এই পূর্বপ্রজন্মের তালিকা তাঁদের স্মৃতিতে থাকলেও, কোনো সরকারি কাগজে প্রমাণ তাঁদের কাছে নেই।

'ভারতমাতা' চিরকাল হিন্দু, উচ্চবর্ণের পুরুষের বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। কিন্তু শাহীনবাগ বা পার্ক সার্কাসে বা অন্যত্র যেখানে তাঁরা প্রতিবাদে বসেছেন, আন্দোলনকারী এই মায়েরা তাদের প্রতিরোধের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত তাঁদের অংশীদারিত্ব ও নাগরিকত্বের দাবি জানাচ্ছেন সরবে। 'ভারতের' এই মায়েরা সারা দিন ও রাত ধরে দেশকে বাঁচানোর স্লোগান দিচ্ছেন। সেই স্লোগানের মাধ্যমেই এই মায়েরা এই উগ্র পুরুষতান্ত্রিক দেশের দখল নিয়ে নিয়েছেন, তাঁরা নেতা হয়ে উঠেছেন। ছাপ্পান্ন ইঞ্চি ছাতির পৌরুষের আর প্রয়োজন নেই, এই মায়েরাই লড়াই করে বাঁচাবেন নিজেদের, পরিবার ও মাটি, বাঁচাবেন নিজেদের দেশ।

জানুয়ারির ১৭ তারিখে, রোহিত ভেমুলার, আত্মহত্যার চার বছর পরেও, তাঁর মা, রাধিকা ভেমুলা, লড়াই জারি রেখেছেন জাতপাত সংক্রান্ত বৈষম্য ও শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। তিন সন্তানকে সম্পূর্ণ একা বড়ো করতে গিয়ে দর্জির কাজ করতে হত, স্কুল ও পড়াশুনো ছাড়তে বাধ্য হন রাধিকা। জীবনে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ে পা দিয়েছিলেন, ছেলে মারা যাওয়ার দিন। সে দিন থেকে আজ পর্যন্ত তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই একমুহূর্তের জন্য বন্ধ করেননি। বর্তমান শাসকেরা তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, আন্দোলন করতে গিয়ে পুলিশের হাতে লাঠি খাওয়ার ভাগ্যও তাঁর হয়েছে। তা সত্ত্বেও সিএএ ও এনআরসি-র বিরুদ্ধে ছাত্রদের আন্দোলনে তিনি নিয়মিত অংশগ্রহণ করে চলেছেন। রাধিকা এখন আর শুধু তাঁর সন্ধানের জন্য লড়েন না। তাঁর লড়াই এখন সেই সকল সন্তানদের জন্য, যাদের জন্য লড়ার কেউ নেই। এক মায়ের অকল্পনীয় শোক জন্ম দিয়েছে প্রতিবাদের, প্রতিরোধের। তাঁর সন্তানের মতো আরো অনেক ছাত্রছাত্রীদের ওপর যে রাষ্ট্র তার শোষণযন্ত্রকে লঘু করতে এক মুহূর্ত ভাবে না, সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রাধিকা ভেমুলার এই প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর।

চা-বাগানে উৎখাত হওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলনরত প্রান্তিক মহিলাই হন, বা প্রতিষ্ঠানের চাপে বাধ্য হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়া সন্তানদের ন্যায়প্রার্থী মা বা নাগরিকত্বের দাবিদার আন্দোলনকারীরা, সকলের প্রতিরোধের ভাষ্যে এই মাতৃত্ব লক্ষ করা যাচ্ছে। রাষ্ট্র ও সমাজ চিরকাল মাতৃত্বের এই রাজনৈতিকতাকে অস্বীকার করা সত্ত্বেও এই বৈশিষ্ট্য প্রতিদিন আরো বেশি রাজনৈতিক হয়ে উঠছে। এনআরসি, সিএএ বিরোধী আন্দোলনের এই মুহূর্তগুলি রাষ্ট্রের কাছে তার জাতীয়তাবাদী আধিপত্যের কাছে না সমবেদনা চায়, না আবেদন রাখে। বরং #womenagainstfascism-এর মায়েরা এই আধিপত্যবাদের সামনে উলটো চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। তাকে ভাঙতে চেষ্টা করছে। আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকের কাছে এক পাঠক জানতে চেয়েছেন যে, সন্তানদের নিয়ে যাঁরা বিক্ষোভ দেখাতে যান তাঁরা কেমন মা? আমার মতে এঁরা এমন মা, যাঁরা উচ্চবর্ণের, হিন্দু, পুরুষতান্ত্রিক বোঝাপড়ার থেকে মাতৃত্বকে অনেক উন্নতর স্তরে অবস্থিত করতে পেরেছেন। নিজেদের পরিবার, নাগরিকত্ব রক্ষার অধিকার, নিজেদের দেশকে রক্ষার আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন সেই মাতৃত্বের রাজনৈতিকরণের মাধ্যমে। নিজেদের আন্দোলনের ভাষা তৈরি করেছেন এই মহিলারা, এই মায়েরা। এই ভাষাতেই তাঁরা তাঁদের দাবির কথা বলেছেন এবং সেই ভাষাতেই তাঁরা প্রতিরোধের নতুন সাহিত্য রচনা করছেন, নতুন নিয়ম কানুন গড়ছেন।

অপ্রকাশিত রাশিয়ার জার্নাল থেকে

বার্লিন প্রাচীরের ২৫তম বার্ষিকী

অরুণ সোম

নভেম্বর ২০১৪। চুয়াত্তর বছর অতিক্রম করার পর ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেরও যেন অবসান ঘটল। ১৯১৭-র ৭ নভেম্বরের রুশ বিপ্লবের পর এত বছর বাদে ঘটে গেল আরো একটি বিপ্লবাত্মক ঘটনা সেটাও নভেম্বরে। ১৯৮৯-এর নভেম্বর— বার্লিন প্রাচীরের পতন। Domino effect-এর মতো তার ধাক্কায় একের পর এক এমন সব অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে চলল যার জেরে দুবছরের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন তো ঘটলই, বিশ্ব রাজনীতির ক্ষেত্রেও অনেক নতুন নতুন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে চলল এবং আজও করে চলেছে।

গত ৯ নভেম্বর জার্মানি মহা সমারোহে বার্লিন প্রাচীর ভাঙার ২৫ তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন করল। বেঠোফেন-এর সংগীতের বাজনার সঙ্গে সঙ্গে আট হাজার ফানুশ রাতের আকাশে উড়ল। উল্লসিত জনতা আরো একবার স্মরণ করল দুই জার্মানির সংযুক্তিকরণের সেই দিনটিকে।

সম্মানিত বিদেশি অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজতান্ত্রিক জোট বিরোধী আন্দোলনের হোতা পোল্যান্ডের তৎকালীন ট্রেড ইউনিয়ন 'পলিডারিটি'র নেতা লেখ্ ওয়ালেসা।

বার্লিন প্রাচীর ধসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক জোটে যেমন ধস নামে তেমনি তার পরিণামে বছর ঘুরতে না ঘুরতে সমাজতন্ত্রের উৎসভূমি সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রেরই অবলুপ্তি ঘটে। সমাজতন্ত্রের পতনে সেদিন পশ্চিম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল।

কিন্তু আজ এত বছর বাদে যেটা স্পষ্টতই চোখে পড়ছে তা এই যে পশ্চিমের এক শ্রেণির বুদ্ধিজীবী সেদিন যথা সময়ের আগে, তড়িঘড়ি করে সমাজতন্ত্রের প্রয়াণবার্তা লিখতে বসে গিয়েছিলেন এবং পশ্চিমি ধাঁচের গণতন্ত্র ও সভ্যতার আধিপত্যকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। বার্লিনের দেয়াল ধসে পড়ার পর ফ্রান্সিস ফুকুইয়ামা তাঁর 'ইতিহাসের সমাপ্তি এবং সর্বশেষ ব্যক্তিটি' গ্রন্থে দৃঢ়তার সঙ্গে এই ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করেছিলেন যে 'আমরা যা প্রত্যক্ষ করছি তা নিছক ঠান্ডা লড়াইয়ের অবসান নয় অথবা যুদ্ধ-পরবর্তী ইতিহাসের একটা বিশেষ পর্বের উত্তরণও নয়— এটা সর্বতোভাবে ইতিহাসেরই সমাপ্তি, অর্থাৎ মানবজাতির ভাবাদর্শগত বিবর্তনের অবসান এবং মানবিক সরকার গঠনের চূড়ান্ত রূপ হিসেবে পশ্চিমি উদারনৈতিক গণতন্ত্রের বিশ্বজনীনতা।'

কিন্তু বিগত পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতায় আমরণ যে সত্য উপলব্ধি করছি তা সম্পূর্ণ ভিন্ন: প্রথমত ইতিহাসের সমাপ্তি কখনো ঘটে না, দ্বিতীয়ত ইতিহাসের দ্বান্দ্বিকতাও একটা ধ্রুব সত্য— ইতিহাসে তাই শূন্যস্থান কখনো শূন্য থাকে না। সর্বোপরি বার্লিন প্রাচীরের পতন এবং ঠান্ডা লড়াইয়ের অবসান একমাত্র বিশ্বব্যাপী এক অস্থিরতার দিকেই আমাদের ঠেলে দিয়েছে।

এই সময়ের মধ্যে পশ্চিমের একাধিপত্যের ফলে তার অবাধ সামরিক হস্তক্ষেপে একের পর এক সংঘটিত আঞ্চলিক যুদ্ধগুলি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যাপক দুঃখকষ্টের সূচনা করেছে এবং দশ লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধ থেকে শুরু করে এই ধরনের অধিকাংশ যুদ্ধই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্ররোচনায় বা তার নেতৃত্বে সংঘটিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই সময় বলকান উপত্যকায় হস্তক্ষেপ করে দ্বিজাতিতত্ত্ব ও ধর্মের ভিত্তিতে যুগোস্লাভিয়া ভেঙে দিতে সক্ষম হয়। এর পরই তার হস্তক্ষেপে আফগানিস্তান ও ইরাকে ব্যাপক ধ্বংসলীলার সূচনা। তিন বছর আগে লিবিয়াতে যে কলকাঠি সে নেড়েছিল তার মাশুল সে দেশকে এখন দিতে হচ্ছে— লিবিয়া গৃহযুদ্ধে বিপর্যস্ত। সিরিয়ার বর্তমান সরকারের সমর্থক, তার বিরোধীপক্ষ এবং কট্টর মৌলবাদীদের ত্রিমুখী গৃহযুদ্ধেও সরকারি পালাবদলের দাবি তুলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জড়িয়ে পড়েছে— প্রকারান্তরে লিবিয়া ইরাক সিরিয়া, এমনকী তুরস্কের সীমান্তবর্তী এলাকা জুড়ে এক অখণ্ড ধর্মরাজ্য কায়েমের যে প্রয়াস চলছে তার পথ প্রশস্ত করে দিচ্ছে, অর্থাৎ সে সব দেশের মাঝখানের প্রাচীর ভেঙে নতুন এক রাষ্ট্র গঠনে মদত দিচ্ছে, যার উলটোটা সে এক সময় ঘটিয়েছিল যুগোস্লাভিয়ার ক্ষেত্রে।

অতি সম্প্রতি বারাক ওবামা প্রশাসন আবার ইরাকে নতুন করে মার্কিন সৈন্য পাঠানোর কথা ভাবছে।

আজও একটি প্রাচীর আছে, যেটি অদৃশ্য প্রাচীর— অর্থনৈতিক অবরোধের প্রাচীর যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সব জোটের সহযোগিতায় তার না-পসন্দ দেশগুলির ওপর— যখন যার ওপর খুশি চাপিয়ে দিচ্ছে। আজ থেকে অর্ধ শতাব্দীরও বেশি আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিউবার বিরুদ্ধে যে অর্থনৈতিক অবরোধ ঘোষণা করেছিল সম্প্রতি তার ওপর থেকে সে তা তুলে নিচ্ছে এমন কথাই শোনা যাচ্ছে এ বছরের ডিসেম্বর থেকে। কী এমন নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হল যার ফলে এই সিদ্ধান্ত? হিসাবটা খুবই সোজা: তুলে নিয়ে আরো বহু জায়গায় আরো বহু রকমের যে অবরোধের প্রাচীর গড়ে তোলা হচ্ছে তাকে আরো মজবুত করার উদ্দেশ্যে— ঠিক এমনই সময়ে যখন উক্রাইনার ঘটনাকে কেন্দ্র করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা পশ্চিমি শক্তিগুলি উদ্ধত রাশিয়ার বিরুদ্ধে সদ্য অর্থনৈতিক অবরোধ গড়ে তুলেছে— এই অবস্থায় কিউবার ওপর থেকে অর্থনৈতিক অবরোধ তুলে নিলে রাশিয়ার বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সহযোগী কিউবাকে রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারলে তাকে আরো বেশি করে বেকায়দায় ফেলা যায়।

মার্কিন রাজনীতির মাপকাঠি একেবারেই অন্য। আজ থেকে বছর সতেরো আগে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্লিন্টন জোর দিয়ে বলেছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর অপরিহার্য জাতি। সেই কারণে ক্ষেত্রবিশেষে তাঁকে পেশি সঞ্চালন করতে হয়। এই সেদিন, ২০১৪ সালের ১৯ ডিসেম্বর বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ঘোষণা করলেন তিনি যখন সদ্য ক্ষমতায় এসেছিলেন সেই সময় থেকে আমেরিকার অবস্থা এখন অনেক ভালো। 'আমেরিকা এখন পৃথিবীর সর্বত্র নেতৃস্থানীয়। যে-কোনো মাত্রাতেই ধরা যাক না কেন, আমেরিকার পুনরভ্যুদয় একটি বাস্তব ঘটনা।' হয়তো এই কারণেই, তাঁর মধ্যে দূরদর্শিতার লক্ষণ দেখতে পেয়েই, তাঁকে আগাম নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল?

জার্মান চ্যান্সেলর আঞ্জেলা সের্কেল এবং অন্যান্য পশ্চিমি নেতৃবর্গ বার্লিন প্রাচীরকে একনায়কতন্ত্রের সমার্থক বলে গণ্য করেন। বার্লিন প্রাচীর পতনের ২৫তম বার্ষিকী উপলক্ষে তিনি তাঁর ভাষণে বলেন 'এই ঘটনা আজকের এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানুষের কাছে এই বিশ্বাসের বার্তাই পৌঁছে দিচ্ছে যে এই দেয়াল, একনায়কতন্ত্র, হিংসা, মতাদর্শ ও বৈরিতার এই দেয়াল ভাঙা সম্ভব।'

জার্মানির পুনঃসংযুক্তীকরণের পর থেকে সে দেশ বলকানে হস্তক্ষেপ থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সক্রিয় সামরিক ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকে। যুগোস্লাভ ফেডারেশন থেকে স্লোভেনিয়ার বিচ্ছিন্নকরণ সহজসাধ্য করে তোলার ব্যাপারে জার্মানির ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সেই ঘটনা আরো এমন সমস্ত ঘটনাকে ত্বরান্বিত করে তোলে যার ফলে ন্যাটো ওই অঞ্চলে সামরিক হস্তক্ষেপ করে এবং পরিণামে যুগোস্লাভ ফেডারেশন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। রাশিয়ার সঙ্গে সুদৃঢ় বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও উক্রাইনার প্রশ্নে জার্মানি মস্কো বিরোধী জোটে ভিড়েছে। জার্মানির মৌন সম্মতিক্রমে উক্রাইনাকে দ্রুত ন্যাটো জোট ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে পশ্চিম বেআইনিভাবে কিয়েভে নির্বাচিত সরকারের উচ্ছেদ ঘটাল। আবার সেই সরকার বদলের দাবি— এবারে শুধু কিয়েভে নয়, খোদ মস্কোতেও চাই।

বার্লিন প্রাচীরের পতনের পর পঁচিশ বছর পার হতে না হতে সেই ঠান্ডা লড়াই আবার ফিরে এল। বার্লিনের প্রাচীর এখন আর নেই, কিন্তু তার বদলে গড়ে উঠছে অন্য এক প্রাচীর। আজকের দিনে কোনো কোনো জাতিকে বিভিন্ন সম্প্রদায় জাতিগোষ্ঠী ও মতাদর্শের ভিত্তিতে বিচ্ছিন্ন করার এ ধরনের যত দৃষ্টিগ্রাহ্য ও অদৃশ্য প্রাচীর গড়ে উঠেছে সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে কুখ্যাত পৃথকীকরণ বা বিচ্ছেদের প্রাকারটি তৈরি করেছে ইজরায়েলিরা— পালেস্তিনের অধিকাংশ ভূখণ্ডের বুক চিরে প্রসারিত হয়েছে ৯৩০ কিলোমিটারব্যাপী এই প্রাচীর। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধবিরতি সীমারেখা লঙ্ঘন করে ইজরায়েল এই প্রাচীর নির্মাণ করেছে তার দেশের নিরাপত্তার অজুহাতে। আন্তর্জাতিক ন্যায়াদালত এই নির্মাণের বিরুদ্ধে রায় দিলেও ইজরায়েল তার পরোয়া করেনি। পালেস্তিনীয়দের কাছে এটা বর্ণবৈষম্যের প্রাচীর, ইজরায়েলীদের কাছে নিরাপত্তার প্রাচীর।

জার্মানি তার নিজের দেশের প্রাচীর ভাঙায় উল্লসিত হলে কী হবে, ইজরায়েলের এই প্রাচীরের মেলায় তার দিক থেকে কোনো প্রতিবাদ নেই। জার্মান সরকার বরং ইজরায়েলের দক্ষিণপন্থী সরকারের গোঁড়া সমর্থক। চ্যান্সেলর আঞ্জেলা সের্কেল বলেছেন : 'জার্মানি কখনো ইজরায়েলকে পরিত্যাগ করবে না, তার প্রকৃত বন্ধু ও অংশীদার হয়ে থাকবে।' অস্বস্তিকর হলেও নিজের অতীতের কথা ভেবে একথা না বলে তার উপায় নেই— নইলে যে আবার তার বিরুদ্ধে নাৎসিবাদের অভিযোগের আঙুল উঠবে! আর মার্কিন সরকার যে টহনি লবি বা গোষ্ঠীর অর্থানুকূল্যেই মূলত পরিচালিত সে কথা কার না জানা আছে। তাই এই দুর্ভেদ্য প্রাচীর, এই অচলায়তন কে ভাঙবে?

একটি হঠকারিতা ও তার পরিণাম

আফগান ট্র্যাজেডি

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান লেওনিদ ইলিচ ব্রেজ্‌নেভের নিজস্ব ক্ষৌরকার ছিল— থাকাই স্বাভাবিক।

খোদ লেওনিদ ইলিচ ব্রেজ্‌নেভের ঘরে এসে সে তাঁর চুল ছাঁটত— সেটাও অবশ্য স্বাভাবিক। যত বার চুল ছাঁটতে আসত তত বার তার একই প্রশ্ন ব্রেজ্‌নেভের কাছে: 'আচ্ছা কমরেড লেওনিদ ইলিচ, আফগান যুদ্ধের খবর কী?' প্রতিবারই ব্রেজ্‌নেভের উত্তর হত সংক্ষিপ্ত, দায়সারা গোছের। বারবার লোকটা একই প্রশ্ন করছে দেখে শেষটা ব্রেজ্‌নেভ চটেমটে গিয়ে লোকটাকে বললেন: 'তবে রে হতভাগা পরামানিকের পো, বারবার সেই আফগানিস্তানের কথা, একই প্রশ্ন— ভেবেছিস কী ব্যাটাচ্ছেলে, অ্যাঁ?' নাপিত সবিনয়ে বললে, 'অপরাধ নেবেন না, কমরেড লেওনিদ ইলচ, আমি দেখেছি যত বার আফগানিস্তানের কথা জিজ্ঞেস করি আপনাকে তত বারই আপনার মাথার চুল খাড়া হয়ে ওঠে, তাতে আপনার চুল ছাঁটতে বড়ো সুবিধে হয় আমার।' এটা কোনো ঘটনা নয়, আটের দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নে বহুল প্রচলিত একটি রসিকতা— চুটকি। তবে এর মধ্যে সত্য যা আছে তা ওই বিভীষিকার অংশটিতে।

১৯৮৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর অপসারণের ফলে সে-দেশে একদশকব্যাপী তার উপস্থিতির অবসান ঘটল। ঠান্ডা লড়াইয়ের শেষ পর্যায়ে ১৯৮৮ সালের ২৫ মে জেনেভা চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত শান্তির কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না আফগানিস্তানে।

রক্ষণশীল মুসলিম সমাজের ওপর জোর করে সমাজতন্ত্র চাপাতে গিয়ে হাফিজুল্লা আমিন যখন দেশবাসীর বিরাগভাজন হলেন এবং পরিণামে যে জনসাধারণ জাহির শাহের রাজতন্ত্রে অথবা দাউদ শাহের সুবিধাভোগী শ্রেণির রাজ্যশাসনেও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিল তাদের থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন তখন পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্য ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে আফগানিস্তানে সামরিক হস্তক্ষেপ করতে হল সোভিয়েত ইউনিয়নকে। তারপর থেকে দীর্ঘ দশ বছর সোভিয়েত ইউনিয়নের গলার কাঁটা হয়ে রইল আফগানিস্তান। সৈন্য অপসারণের পর, সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাবার পর তার উত্তরাধিকারী রাশিয়ার কাছে এখন সে হয়ে আছে গোদের ওপর বিষফোড়া। রাজনীতিতে অদূরদর্শিতার ফল কত সুদূরপ্রসারী হতে পারে তার আরো একটি প্রমাণ।

১৯৭৩ সালে আফগানিস্তানে প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রের ফলে জাহির শাহের রাজতন্ত্র উৎখাতের পর দাউদ শাহ সুবিধাভোগী শ্রেণির শাসন প্রবর্তন করলেন। পরবর্তীকালে সেই দাউদ শাহের পতন প্রতিবেশী আফগানিস্তানে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার সূচনা করলে সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনৈতিক মহলে দুশ্চিন্তার তেমন কোনে কারণ দেখা দেয়নি, যেহেতু কাবুলে কমিউনিস্টরা এবং তাদের আফগান জনগণতান্ত্রিক পার্টি তখন নতুন সরকারের অংশীদার। তারও অনেক পরে আফগান পরিস্থিতি সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে সত্যি সত্যি উদবেগজনক হয়ে ওঠা সত্ত্বেও ১৯৭৯ সালের ১৭ মার্চ সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরোর এক সভায় কেজিবি-র তৎকালীন অধিকর্তা ইউরি আন্দ্রোপভ্‌ আফগানিস্তানে সোভিয়েত হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেন। বিদেশমন্ত্রী আন্দ্রেই গ্রোমিকো এই প্রসঙ্গে বলেন: 'আফগানিস্তানে সেনাবাহিনী পাঠানোর চিন্তা আমাদের বর্জন করা উচিত বলে কমরেড আন্দ্রোপভ্‌ যে অভিমত প্রকাশ করেছেন আমি তার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। আফগান সেনাবাহিনী ঠিক নির্ভরযোগ্য নয়, এর ফলে আমরা আগ্রাসীরূপে চিহ্নিত হব। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে সেনাবাহিনী? আফগান জনগণের বিরুদ্ধে! আমাদের সেনাবাহিনীকে তাদের ওপর গুলিবর্ষণ করতে হবে! স্থূলভাবে বলতে গেলে, আফগান নেতাদের ভুলত্রুটির কোনো শেষ নেই, তাঁরা তাঁদের নিজেদের দেশের জনসাধারণের কোনো সমর্থন পাননি।...আমাদের বাহিনী পাঠানোর অর্থ হবে আমাদের আফগানিস্তান অধিকার করা। এর ফলে আমরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক জটিল পরিস্থিতিতে পড়ে যাব। এত কষ্ট করে আমরা যা গড়ে তুলেছি এর ফলে আমরা সে সব নষ্ট করে ফেলব।' প্রধানমন্ত্রী আলেক্সেই কোসিগিন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের প্রেসিডিয়ামের সভাপতি লেওনিদ ইলিচ ব্রেজ্‌নেভ্‌ও এতে একমত হন।

সেপ্টেম্বরে নুর মহম্মদ তারাকি নিহত হওয়ার পর সোভিয়েত ইউনিয়নের কোনো কোনো রাজনৈতিক মহলে একটা আশঙ্কা ঢুকে গেল যে তাঁর উত্তরসূরি হাফিজুল্লা আমিন এক ধরনের টিটো হতে চলেছেন। পার্টির নিয়ন্ত্রণ তাঁর ওপর থাকবে না। এই ধারণার ফলে সোভিয়েত রাজনৈতিক মহলে আগেকার মূল্যায়নের পুনর্বিবেচনার সূত্রপাত। হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ওই ১৯৭৯ সালেরই ১২ ডিসেম্বর। এবারে কিন্তু কট্টরপন্থী প্রতিরক্ষামন্ত্রী দ্‌মিত্রি উস্তিনভের প্ররোচনায় আন্দ্রোপভ্‌ তাঁর মত পালটে ফেললেন। গ্রোমিকোও শামিল হলেন তাঁদের সঙ্গে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী আলেক্সেই কোসিগিন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক আন্দ্রেই কিরিলেঙ্কো আগের মতোই বাধা দেন। এর পর থেকে অসুস্থতার অজুহাতে কোসিগিন ধীরে ধীরে রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্র থেকে আড়ালে সরে যান, আর কিরিলেঙ্কো পরবর্তীকালে কোনো অজ্ঞাত কারণে আত্মহত্যা করেন।

১৯৮৯ সালে সুপ্রিম সোভিয়েতের অনুসন্ধান কমিটির পেশ করা বিবরণীতে দেখা যাচ্ছে বিষয়টি আলোচনার জন্য পলিটব্যুরোর অনেক সদস্যই সেদিন উপস্থিত ছিলেন না।

ব্রেজ্‌নেভ্‌ উস্তিনভ্‌, আন্দ্রোপভ্‌ ও গ্রোমিকো গোপনে মিলিত হওয়ার পর সিদ্ধান্ত নিয়ে 'যে কাজ করা হয়ে গেছে তার আর চারা নেই'— এই মর্মে নোটিশ জারি করে পলিটব্যুরোর বাদবাকির সদস্যদের ওপর, কেন্দ্রীয় কমিটি ও সুপ্রিম সোভিয়েতের ওপর তা চাপিয়ে দেন। পরবর্তীকালে আরো জানা যায় যে, চোদ্দো জন পলিটব্যুরোর সদস্যের মধ্যে নজন সে-সভায় উপস্থিত ছিলেন।

অথচ এই আন্দ্রোপভ্‌ই ১৯৮২ সালে সোভিয়েত নেতৃত্বে ব্রেজ্‌নেভের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার পর আফগানিস্তান থেকে অপসারণের ব্যাপারটিকে বড়ো রকমের গুরুত্ব দেন। কিন্তু ইতিমধ্যে জল অনেক ঘোলা হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগান সাড়া দিলেন না। দিলেন না এই কারণে যে ততদিন তিনি আফগান মুজাহিদীন ও পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য দানের জন্য পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়ার সঙ্গে চুক্তি করে বসেছেন। পাকিস্তান সরাসরি জড়িত হয়ে পড়েছে আফগান যুদ্ধে। তার আশা, জয় তাদের হবেই। তবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে চুক্তি কেন? এদিকে মস্কো যখন ভুল সংশোধনের জন্য শান্তির প্রয়াস চালিয়ে যেতে উৎসুক, তখন কাবুলে তারই দাক্ষিণ্যে ক্ষমতাসীন বারবাক কারমাল তেমন সহযোগিতা তো করছেনই না, বরং বেঁকে বসছেন। অবশ্য ক্রেমলিনও এ-ব্যাপারে দ্বিধাবিভক। বারবাক কারমাল সে-সুযোগ গ্রহণ করছেন।

আলাপ-আলোচনায় গতি সঞ্চারিত হল আরো অনেক পরে, ১৯৮৫ সালে, গর্বাচ্যোভ্‌ ক্ষমতায় আসার পর। তাঁকে বারবাক কারমালের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে হয়। ১৯৮৬ সালে কোনোরকম শিষ্টাচারের বালাই না রেখে বারবাক কারমালকে বিদায় দিলেন গর্বাচ্যোভ্‌। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন আফগানিস্তানের গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান নাজিবুল্লা। বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি এই নিয়োগ। সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল আখরোমেইয়েভ ও সরকারি বিদেশমন্ত্রী গেওর্গি করনিয়েন্‌কোর প্রতিবাদ সত্ত্বেও কেজিবি-র নবনিযুক্ত প্রধান ভ্লাদিমির ক্র্যুচ্‌কোভ্‌ ও বিদেশ মন্ত্রী এদুয়ার্দ শেভার্দ্‌নাদ্‌জের সমর্থনে আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হলেন নাজিবুল্লা। উল্লেখযোগ্য এই যে, পরবর্তীকালে আখ্‌রোমেইয়েভ্‌ও আত্মহত্যা করেন রহস্যজনক পরিস্থিতিতে।

১৯৮৬ সালে নাজিবুল্লাকে নিয়োগ করার সময় তাঁর সঙ্গে গর্বাচ্যোভের প্রাথমিক শর্ত ছিল এই যে নাজিবুল্লার সরকার হবে জোট সরকার, যেখানে সামগ্রিকভাবে দেশের রক্ষণশীল শক্তিগুলিও স্থান পাবে এবং তার উদ্দেশ্য হবে মুখ্যত প্রতিরোধকারী সামরিক গোষ্ঠীগুলিকে আকর্ষণ করা। কিন্তু কর্তা বলেন এক, তাঁর পরিষদ বলেন আর এক। নাজিবুল্লার সঙ্গে কথাবার্তায় সোভিয়েত বিদেশ মন্ত্রী সেভার্দ্‌নাদ্‌জে সে-আইডিয়ার বিরোধিতাই করেন।

অবশ্য তখন আর কোনো উপায়ও ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ততদিনে ভালোমতো জড়িয়ে পড়েছে এই প্রক্সি যুদ্ধে। সোভিয়েতের লেজে-গোবরে অবস্থা দেখে ভিয়েতনামে তার নিজের যা হাল হয়েছিল সে-কথা স্মরণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন উল্লসিত। বর্তমান শাসন ব্যবস্থা থেকে সম্প্রসারিত কোনো সরকারই তার কাছে গ্রাহ্য নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃঢ়বিশ্বাস, সোভিয়েত সেনাবাহিনী অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে নাজিব-সরকারের পতন ঘটবে, তাই একমাত্র অপসারণের ওপরই সে বারবার জোর দিয়ে আসছিল। স্মরণ করা যেতে পারে, সোভিয়েত ইউনিয়নের অপসারণ এবং অতঃপর কাবুল সরকারের গঠনবিন্যাস—এই সূত্রটি ১৯৮৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নই দিয়েছিল।

আফগান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল জেনেভায়, ১৯৮৮ সালের ১৫ মে। কিন্তু সেখানে একটি ফাঁক থেকেই যায়। দুই বৃহৎ শক্তির কেউই যে তাদের পোষ্যদের মদত দেবে না এমন কোনো শর্ত সেখানে ছিল না। ফলে প্রক্সি যুদ্ধ যথারীতি চলতে লাগল— সোভিয়েত সেনাবাহিনী অপসারণের পরও। তবে ইতিমধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের পূর্বাভাস দেখা দেওয়ায় তার তরফ থেকে তৎপরতা অনেকটা ক্ষীণ হয়ে আসছিল। পরন্তু আফগানিস্তানে তাদের দায়দায়িত্ব সম্পর্কে বর্তমান সোভিয়েত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিরও আমূল পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। সোভিয়েত পৃষ্ঠপোষিত আফগান সরকারের বিরোধিতা করায় সোভিয়েত ইউনিয়নের পত্র-পত্রিকায় ও বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে এককালে যারা 'দুশমন' নামে পরিচিত ছিল তখন থেকে তারা মর্যাদা পেল মুজাহেদের। ১৯৯১ সালের নভেম্বরে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাবার মাস খানেক আগে তাদেরই কয়েকটি উপদলের এক প্রতিনিধিদল মস্কোয় এসেছিল আফগান সমস্যা নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে। তারা যে তখন সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচ্যোভের সঙ্গে আলোচনার থেকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলৎসিনের সঙ্গে আলোচনায় বসার ওপর বেশি জোর দিচ্ছিল এতে তাদের দূরদর্শিতার পরিচয় মেলে। কিন্তু রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট তাঁর রসবোধের পরিচয় দিলেন নিজে অনুপস্থিত থেকে তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট আলেক্সান্দ্র রৎস্কোইকে আলোচনায় ভিড়িয়ে দিয়ে। রুৎস্কোইয়ের কাছে এই সাক্ষাৎকার ছিল এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। আফগান যুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন আফগানিস্তানে সোভিয়েত বোমারু বিমানবাহিনীর রেজিমেন্ট কম্যান্ডার— কর্নেল। যুদ্ধে দুবার আহত হয়ে বন্দী হয়েছিলেন শত্রুবাহিনীর হাতে। প্রথম বার পালাতে সক্ষম হন। দ্বিতীয় বার ভারতের

মধ্যস্থতায় বন্দীবিনিময়ের ফলে মুক্তি লাভ করেন। যুদ্ধে কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি তাঁর নিজের দেশের 'সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর'— এই সরকারি খেতাব লাভ করে। আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি। গর্বাচ্যোভ্ থেকে ইয়েল্ৎসিন ইয়েল্ৎসিন থেকে রুৎস্কোই— গড়াতে গড়াতে বিপজ্জনক স্নোবলের আকার ধারণ করে আফগান-সমস্যা।

আজকের দিনে আফগানিস্তানে যে পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে, তার কারণ আপস-আলোচনার সময় দুই বৃহৎ শক্তিরই দেশটির ভবিষ্যৎ গঠনবিন্যাস সম্পর্কে সমঝোতায় আসতে না পারা, অন্য দিকে আফগান গোষ্ঠীগুলিরও নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নিতে অসম্মতি।

মুজাহেদির নামে পরিচিত মুসলিম মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে কাবুলের কমিউনিস্ট সরকারের পতনের পাঁচ বছর পরে আজও আফগানিস্তানে ইসলামের নামে যুদ্ধ অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু এখন যুদ্ধ চলছে প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিম গোষ্ঠীগুলির মধ্যে।

১৯৯২ সালের ২৮ এপ্রিল বিজয়ী মুজাহিদরা কাবুলে তাদের ইসলামি সরকারের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়ে আফগান কমিউনিস্টদের চোদ্দো বছরব্যাপী শাসনের অবসান সূচনা করল।

অতঃপর রাষ্ট্রসংঘ নাজিবুল্লাকে পদত্যাগ করতে বললে নাজিবুল্লা তাতে সম্মত হলেন। তিনি কাবুলে রাষ্ট্রসংঘের চত্বরে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। ততদিনে সোভিয়েত ইউনিয়ন আর নেই। সেই একই নীতির পুনরাবৃত্তি যা দেখেছি হোনেকারের বেলায়। নতুন রাশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানের এ-ব্যাপারে কোনো দায়দায়িত্ব নেই। সকলেই হাত ধুয়ে ফেলল। প্রায় চার বছর অবরুদ্ধ অবস্থায় কাটানোর পর ১৯৯৬ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর ভোররাতে 'সুরক্ষিত স্থানে' তালিবানের হাতে নৃশংসভাবে নিহত হলেন নাজিবুল্লা। সেই পুরোনো ইতিহাস। এই ভাবেই ১৯৬১ সালে জাতি সংঘের হেফাজতে থাকাকালে জাতি সংঘের বিশেষ প্রতিনিধির চোখের সামনে আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছিলেন প্যাট্রিস লুমুম্বা। (ঘটনাচক্রে তিনি ছিলেন ভারতের নাগরিক রাজেশ্বর দয়াল)

বেলুড় মঠে মোদী!

গৌতম রায়

বেলুড় মঠের যে প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মানুষে মানুষে বিভাজনের উদ্দেশে তাঁর রাজনৈতিক কর্মসূচি, এনআরসি— এনপিআর—সিএএ-এর পক্ষে সওয়াল করেছেন, সেই প্রাঙ্গণটিতেই বেলুড় মঠের দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয়। মঠের সূচনাকালের একটা ঘটনা দিয়ে সেই প্রাঙ্গণটিতে বলা নরেন্দ্র মোদীর বিভাজনমূলক বক্তৃতার বিষয়বস্তুর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যেতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ শিষ্যরা তখন জীবিত। মঠের ওই প্রাঙ্গণে সেই মাটিতে তখন নানা ধরনের আগাছা জন্মায়। চোরকাঁটাও জন্মায় প্রচণ্ড পরিমাণে। বেলুড় মঠের মহারাজের হিসেবে তখন কর্মরত রয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ শিষ্য স্বামী প্রেমানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলের যিনি বাবুরাম মহারাজ নামে পরিচিত। মঠের অন্যান্য সাধু ব্রহ্মচারীদের নিয়ে সেই প্রাঙ্গণে তিনি নিজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার কাজে দিনের অনেকখানি সময় খরচ করতেন। প্রাঙ্গণটি পরিষ্কার করতে করতে একদিন বেশকিছু চোরকাঁটা স্বামী প্রেমানন্দের গৈরিক বসনে আটকে যায়। তখন তিনি খানিকটা বিরক্তি সহকারে সতীর্থদের কাছে জানতে চান, এই প্রাঙ্গণটি কারা পরিষ্কার করেছেন? যে ব্রহ্মচারীরা প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করেছিলেন, তাঁরা স্বামী প্রেমানন্দের কাছে খানিকটা তিরস্কৃত হন এই কারণে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলের ব্যক্তিত্বদের বিশ্বাস, মঠের সর্বত্র, এমনকী ওই মাঠের ওপর দিয়ে সূক্ষ্ম শরীরে শ্রীরামকৃষ্ণ হেঁটে বেড়ান। তখন জীবনাবসান হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের। চর্মচক্ষুতে তাঁকে দেখা যায় না। এই অবস্থাতে স্বামী প্রেমানন্দ বললেন; শ্রীরামকৃষ্ণ এই মাঠে হেঁটে বেড়ান। পায়চারি করেন। তাঁর নিশ্চয়ই আজকে পায়ে ব্যথা লেগেছে। নিশ্চয়ই কাপড়ে চোরকাঁটা লেগেছে। শ্রীরামকৃষ্ণকে ঘিরে তাঁর পরিমণ্ডলের মানুষদের এমনটাই ছিল ভালোবাসা।

সেই মাঠে, বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষে যুব দিবসে কার্যত রবাহুতভাবে বেলুড়মঠ কর্তৃপক্ষ আয়োজিত সভায়, ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাঁর দলীয় কর্মসূচি অনুযায়ী পরিচালিত এনআরসি বিষয়ক যে বক্তৃতা করলেন, তা শুধু শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, সারদা দেবীর সমন্বয়ী চিন্তাধারার মূলে কুঠারাঘাতই নয়, ভারতবর্ষের চির প্রবাহমান বহুত্ববাদী সমন্বয়ী চিন্তা-চেতনার গঙ্গাযাত্রা বললে আশা করি অত্যুক্তি হবে না।

বেলুড় মঠের প্রাঙ্গণ-উদ্যান সমস্ত কিছুকে যখন শ্রীরামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলের সাধু ব্রহ্মচারী থেকে শুরু করে সাধারণ ভক্তেরা তাঁদের প্রণম্য ব্যক্তিত্বের বিচরণভূমি হিসেবে মনে করেন, সেই মানসিকতার মূলে কুঠারাঘাত হানা শুরু হয়, গত নবছর আগে থেকেই। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেলুড় মঠের ভক্ত হিসেবে নিজের পরিচয় তুলে ধরতে বেলুড় মঠের যত্রতত্র নিজের অবাধ বিচরণ ভূমি হিসেবে সাব্যস্ত করে নেন। বেলুড় মঠের উদ্যান থেকে ফুল তুলে, সেই ফুল হাতে তাঁর ছবি তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় ব্যানারে কলকাতা শহর ছেয়ে যায়।

স্বামী বিবেকানন্দের প্রয়াণ কক্ষে ইন্দিরা গান্ধির মতো শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত পরিমণ্ডলের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব প্রবেশের প্রশ্নে অত্যন্ত দ্বিধান্বিত ছিলেন। কারণ; রামকৃষ্ণ মিশনের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সন্ন্যাসীর কক্ষে কখনো কোনো নারী প্রবেশ করেন না। ইন্দিরার মা কমলা নেহরু শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ স্বামী শিবানন্দর প্রত্যক্ষ শিষ্য হওয়া সত্ত্বেও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রচলিত নিয়ম নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল শ্রীমতি গান্ধি এই সমস্ত নিয়ম নীতি কিন্তু অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে মেনে চলতেন।

সেই রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের প্রয়াণ কক্ষ থেকে শুরু করে, বেলুড় মঠের প্রায় সর্বত্রই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবাধ গতিবিধি একদম জলচল করে দিয়েছিলেন। তাই নরেন্দ্র মোদী কেবলমাত্র দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নয়, কার্যত দেশের শাসক দল বিজেপির শীর্ষ নেতা হিসেবে, বিভাজনের উদ্দেশে তৈরি করা এনআরসি, সিএএ-র মতো চরম মুসলিমবিদ্বেষী দৃষ্টিভঙ্গিগুলিকে যখন বিবেকানন্দের মতো পরম মানবিক, সর্বধর্ম সমন্বয়ী চেতনায় গভীরভাবে বিশ্বাসী, সকল জীবের মধ্যে শিবকে উপলব্ধি করার মতো নয়

আত্মনিবেদিত ব্যক্তিত্বকে, বিকৃত ভাবে উপস্থাপিত করেন, এবং সেই উপস্থাপনাকে প্রতিবাদ তো দূরের কথা, শিষ্টতার দোহাই দিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক, কার্যত নরেন্দ্র মোদীকে তাঁদের ইষ্টদেবতার আসনে বসাবার মতো মানসিকতার পরিচয় দেন, মাত্র ত্রিশ সেকেন্ডের ভেতর নরেন্দ্র মোদী কীভাবে বিছানায় ঘুমিয়ে পড়তে পারেন, তার ভক্তি-গদগদ ধারাবিবরণী সংবাদমাধ্যমের সামনে উপস্থাপিত করেন— তখন আমাদের মনে পড়ে যায়, বিবেকানন্দের জীবনের কিছু ঘটনাবলি।

আমেরিকায় থাকাকালীন বিবেকানন্দের বক্তৃতাবলি শর্টহ্যান্ডে লিখে নিতেন গুডউইন নামে তাঁর এক সহকারী। একদিন এইরকম বক্তৃতা লেখার পর তিনি সেটি বিবেকানন্দকে দেখাতে এসেছেন। সেটি দেখে বিবেকানন্দ আঁতকে উঠে বললেন; একী করেছ? একথা তো আমি তোমাকে বলিনি।

গুডউইন তখন বলেন; না, আপনি বলেননি ঠিকই। কিন্তু আমার মনে হয়েছে, আপনি এ রকমই বলতে চেয়েছেন।

বিরক্ত বিবেকানন্দ তখন গুডউইনকে বলেন; মাতব্বরি করবে না। যেটুকু বলব শুধু সেটুকুই লিখবে। যেটি পারবে না, সেটি ফাঁকা রাখবে। আমি ঠিক করে দেব।

নিজের দলের রাজনৈতিক কর্মসূচিকে প্রতিষ্ঠা করতে বেলুড় মঠের মতো সর্বধর্ম সমন্বয় সাধনার পীঠস্থানকে ব্যবহার করে, বিবেকানন্দকে যেভাবে বিকৃত করে গেলেন নরেন্দ্র মোদী এবং তাঁর যাবতীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করে গেলেন বেলুড় মঠের সাধারণ সম্পাদক স্বামী সুবীরানন্দ, তাতে তাঁদের উদ্দেশে বিবেকানন্দের সেই ঐতিহাসিক উক্তি 'মাতব্বরি করবে না' শব্দটি বারবার উচ্চারণ করতে ইচ্ছে করে।

সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থ সিদ্ধির তাগিদে সমন্বয়ী চেতনার প্রতীক বেলুড় মঠের মঞ্চকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ব্যবহার করা এবং সেই ব্যবহারের গায়ে একটা ধরি মাছ, না ছুঁই পানি-গোছের অবস্থান গ্রহণ করে, কার্যত এই রাজনৈতিক পটভূমিকার প্রতি বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষের গরিষ্ঠ অংশের একটা সহানুভূতিশীল মনোভাব প্রকাশ্যে আসবার পর, বর্তমান নিবন্ধকারের মনে পড়ে যাচ্ছে; শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ শিষ্য স্বামী শিবানন্দর দীক্ষিত শিষ্য তথা রামকৃষ্ণ মিশনকে আন্তর্জাতিক স্তরে আরো বেশি ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের পর যাঁর ভূমিকা ঐতিহাসিক, সেই স্বামী লোকেশ্বরানন্দর একটি উক্তি।

তিনি একবার বলেছিলেন; যদি কখনো কোনো বাড়িতে যাও, সেই বাড়ির মানুষজন কেমন, তাঁদের রুচি, আচার-আচরণ কেমন তা তুমি জানতে পারবে, যদি সেই বাড়িটির রান্নাঘরে যাও, আর তাঁরা যে বাথরুমটি ব্যবহার করছেন, সেই বাথরুমে ঢুকে দেখো।

যদি দেখো রান্নাঘর আর বাথরুম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রয়েছে, তা হলে বুঝতে পারবে যে, বাড়ির মানুষজন ঠিক ঠিক আছে। ধর্মের সঙ্গে যুক্ত।

এজন্য 'বাৎসল্য থেকে তাচ্ছল্যে'র উত্তরণের যে রূপের কথা শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন (শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত, অখণ্ড সংস্করণ। উদ্বোধন। পৃষ্ঠা-৮৬৪), ভগিনী নিবেদিতা, যেভাবে বাথরুমের কাপড়েই নিঃসংকোচে ঠাকুরঘরে ঢুকে যাওয়ার সাহস দেখিয়েছিলেন, তারই একটি প্রাঞ্জল ব্যঞ্জনা লোকেশ্বরানন্দ ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

আজ নরেন্দ্র মোদীর বেলুড়মঠ প্রাঙ্গণকে দেশের আপামর মুসলমান সমাজের নাগরিকত্ব হরণের একটি অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করার তাগিদ থেকে, এই বাথরুম পরিষ্কার আর রান্নাঘর পরিষ্কার করার প্রসঙ্গটি বারবার যেন মূর্ত হয়ে উঠছে। রান্নাঘর আর বাথরুমকে অপরিচ্ছন্ন রেখে, অর্থাৎ; দেশের মানুষের জীবনের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক, সমস্ত রকমের দাবি-দাওয়া, প্রয়োজনীয়তার দিকগুলিকে অস্বীকার করে, গুজরাট গণহত্যার সময়কালে, মুসলমানের রক্তে হাত রাঙিয়ে, সমন্বয়ী সাধনার প্রতীক, শ্রীরামকৃষ্ণের নামাঙ্কিত বেলুড় মঠে দাঁড়িয়ে নরেন্দ্র মোদী তাঁর রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনের ভেতর দিয়ে যে ক্লিন্ন, কদর্য মানসিকতার পরিচয় দিয়ে গেলেন, এবং সেই মানসিকতাকে গৌরবান্বিত করবার তাগিদে, রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মকর্তাদের একটি বড়ো অংশ, সাধারণ শ্রীরামকৃষ্ণ অনুরাগীদের সমস্ত রকমের শ্রদ্ধা-ভালোবাসা-ভাললাগাকে বিন্দুমাত্র মর্যাদা না দিয়ে, কার্যত যেভাবে নরেন্দ্র মোদীর গুণকীর্তনের ভেতর দিয়ে, তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, যে দৃষ্টিভঙ্গির সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা, পরমত অসহিষ্ণুতা, পরধর্ম অসহিষ্ণুতা, তাকে সমর্থন জানালেন— তা কোনো অবস্থাতেই শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, বা তাঁদের সতীর্থদের, উদার, মানসিক, ধর্মনিরপেক্ষ, পরমতসহিষ্ণু দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে কোনো অবস্থাতেই সাযুজ্যপূর্ণ নয়।

পবিত্র ইসলামকে অসম্মানিত করে, অমর্যাদাকর জায়গায় উপস্থাপিত করে, ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষদের সম্বন্ধে ঘৃণার পরিবেশ তৈরি করে, তাঁদের প্রাণে মেরে, ভাতে মেরে যে নরেন্দ্র মোদী, তাঁর রাজনৈতিক হিন্দুত্বের ভেতর দিয়ে নিজের জনপ্রিয়তার টিআরপি বাড়ানোর চেষ্টা করেন, সেই ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ একটি চিঠিতে মোহাম্মদ সরফরাজ হোসেনকে লিখেছিলেন;

'বেদান্তের মতবাদ যতই সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর হউক না কেন, কর্মপরিণত ইসলাম ধর্মের সহায়তা ব্যতীত তাহা মানব সাধারণের অধিকাংশের নিকট সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক। আমরা মানব জাতিকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে চাই-যেখানে বেদও

নাই, বাইবেলও নাই, কোরানও নাই অথচ বেদ, বাইবেল, কোরানের সমন্বয় দ্বারাই ইহা করিতে হইবে। মানবকে শিখাইতে হইবে যে, সকল ধর্ম 'একাত্মরূপ সেই এক ধর্ম' এরই বিবিধ প্রকাশ মাত্র, সুতরাং যাহার যেটি সর্বাপেক্ষা উপযোগী সেটিকেই বাছিয়া লইতে পারে।

আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও মুসলমান ইসলামধর্মরূপ এই দুই মহান মতের সমন্বয়ই— বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামি দেহ— একমাত্র আশা।'

এই প্রসঙ্গে ১৮৯৭ সালে সতীর্থ স্বামী অখণ্ডনন্দাকে লেখা বিবেকানন্দের একটি চিঠি উল্লেখ করতে হয়। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম সেবা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সারগাছিকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট চিঠিতে বিবেকানন্দ লিখছেন;

'(সেখানে) মুসলমান বালক লইতে হইবে বইকি এবং তাদের ধর্ম নষ্ট করিবে না।...যাহাতে তাহারা নীতিপরায়ণ, মনুষ্যত্বশালী এবং পরহিতকর হয়, এই প্রকার শিক্ষা দিতে হবে। ইহারই নাম ধর্ম-জটিল দার্শনিক তত্ত্ব এখন শিকেয় তুলে রাখ।'

যে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষদের সম্পর্কে একটা ঘৃণার ভূগোলকে প্রলম্বিত করে, ভারতবর্ষের চিরন্তন বহুত্ববাদী সংস্কৃতি, সমন্বয়ী চেতনাকে বিনষ্ট করতে চায় নরেন্দ্র মোদী, সেই ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সম্পর্কে বিবেকানন্দের অনুধ্যান হল;

'মহম্মদ সাম্যবাদের আচার্য, তিনি মানবজাতির ভ্রাতৃভাব— সকল মুসলমানের ভ্রাতৃভাবের প্রচারক, ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ।'

'জগতের মহত্তম আচার্যগণ'— নামক এক বক্তৃতায় আমেরিকায় বিবেকানন্দ বলছেন; 'কোন ধর্মই কখনো মানুষের ওপর অত্যাচার করে না, কোন ধর্মই ডাইনি অপবাদ দিয়ে নারীকে পুড়িয়ে মারে নি, কোন ধর্মই কখনো এই ধরনের অন্যায় কাজের সমর্থন করে নি।...রাজনীতি মানুষকে এসব অন্যায় কাজ করতে প্ররোচিত করেছে, ধর্ম নয়।...যখন কোনো ব্যক্তি উঠে বলে আমার ধর্মই সত্য ধর্ম, আমার অবতারই একমাত্র সত্য অবতার, সে ব্যক্তির কথা কখনোই ঠিক নয়, সে ধর্মের গোড়ার কথা জানে না।'

বিবেকানন্দ বলছেন; 'ভারতবর্ষে দরিদ্রের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা এত বেশি কেন? একথা বলা মূর্খতা যে, তরবারি সাহায্যে তাদেরকে ধর্মান্তর গ্রহণে বাধ্য করা হয়েছিল। বস্তুত জমিদার ও পুরোহিতদের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্যই তারা ধর্মান্তর গ্রহণ করেছিল।'

'প্রাচ্য পাশ্চাত্য' প্রবন্ধে বিবেকানন্দ খুব স্পষ্ট ভাবে বলছেন; 'ইসলাম যেখানে গিয়েছে, সেথায়ই আদিম-নিবাসীদের রক্ষা করেছে। সেসব জাত সেথায় বর্তমান। তাদের ভাষা, জাতীয়ত্ব আজও বর্তমান।'— এহেন বিবেকানন্দের মানস সন্তান স্বরূপ তাঁর স্মৃতিধন্য বেলুড় মঠের জমিতে দাঁড়িয়ে, এনআরসি-সিএএ-এনপিআর-এর মতো, হিন্দু মুসলমানের বিভেদ তৈরি করে, মুসলমানকে ভারতবর্ষের নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করবার মূল কারিগর নরেন্দ্র মোদীকে, তাঁর রাজনৈতিক অভিসন্ধির সঙ্গে বেলুড় মঠকে সংযুক্ত করবার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আন্দোলনের সার্বিক ভাবাদর্শের বিরোধী।

আমেরিকায় অবস্থানকালে বিবেকানন্দকে একজন প্রশ্ন করেছিলেন; আপনি মোহাম্মদের এত প্রশংসা করছেন, মোহাম্মদ তো অনেক খারাপ কাজ করেছেন। ধর্মের নামে হিংসার প্রশ্রয় দিয়েছেন। গর্জে উঠেছিলেন বিবেকানন্দ। স্পষ্ট ভাষায় তিনি বলেছিলেন; 'দি ক্যারেক্টারস অফ দ্য গ্রেট সোলস আর মিস্টিরিয়াস, দেয়ার মেথডস পাস্ট আওয়ার ফাইন্ডিং আউট। উই মাস্ট নট জাজ দেম। ক্রাইস্ট মে জাজ মোহাম্মদ। হু আর ইউ অ্যান্ড আই? লিটিল বেবিস। হোয়াট ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড অফ দিজ গ্রেট সোলস?' "The Complete Works of Swami Vivekananda". (Vol 1. Advaita Ashrama. Kolkata. Page-482)

খ্রিস্ট সম্বন্ধে বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক উক্তি; আমি যদি ন্যাজারেথের যীশুর সময় প্যালেসাইনে থাকতাম, তা হলে চোখের জল দিয়ে নয়, বুকের রক্ত দিয়ে তাঁর পা ধুইয়ে দিতাম। (The Master as I saw Him—Sister Nivedita. Udbhodnan. 2010 Edition. Page-233)।

বিবেকানন্দ স্পষ্টতই বলেছেন; ধর্মকে কেন্দ্র করে মানুষ, সমাজ-সভ্যতার যে ক্ষতি হয়, তার জন্য দায়ী ধর্মকে ব্যবহার করার পদ্ধতি। ধর্মকে যারা স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে, বাণিজ্যের উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করে তারাই ধর্মের নামে সমাজে অশান্তি, বিদ্বেষ, বৈষম্য, নিপীড়ন ও রক্তপাত নিয়ে আসে। এ সমস্ত কিছুর জন্য ধর্মকে দোষ দেওয়া উচিত নয়। কারণ, ধর্ম তার জন্য দায়ী নয়। সুতরাং ধর্মকে এই সমস্ত 'অধর্মের' জন্য দোষ দিও না। বাস্তবিক, ধর্মের তো কোন দোষ নেই। ধর্ম মানুষকে প্রেম শেখায়, পবিত্রতা শেখায়, উদার হতে শেখায়। ধর্ম কখনও সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেয় না। ধর্মকে কেন্দ্র করে সম্প্রদায় তৈরি হয়। সম্প্রদায়গুলি সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দেয় যা কিনা ধর্মের শিক্ষার বিরোধী।'

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় শ্রীরামকৃষ্ণের বলা একটি গল্পের। তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলেছিলেন; একজন লোক প্রদীপের আলোতে ভাগবত পাঠ করছে। আর একজন লোক সেই প্রদীপের আলোতে দলিল জাল করছে। তাই তাঁর প্রশ্ন ছিল, এখানে আমি প্রদীপের আগুনের কি দোষ খুঁজে পাব? নির্লিপ্ত আগুনকে ব্যবহার করে যে অন্যায় কাজ করছে, দোষের

কাজ তো সেই-ই করছে। গোটা ঘটনাক্রমের জন্য দায়িত্ব সেই লোকটিরই। আগুনকে আমরা কীভাবে ব্যবহার করব— সেটাই হল মূল কথা।

এই ভাবনায় কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের চেতনাকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশনের ভাবনা-চিন্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছিলেন। তাই তিনি বলেছিলেন; যতগুলি মানুষ আছে ততগুলি সম্প্রদায় থাকুক, তাতে কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব যেন কখনো না থাকে। এই দৃষ্টিটা চাই। সম্প্রদায় থাকুক, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা যেন না থাকে। (Complete Works. Vol-3. Page-371-372)।

একই কথা শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন; এক রাম তাঁর হাজার নাম। সাম্প্রদায়িকতাকে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অনবদ্য লোকায়ত ভাষায় 'মতুয়ার বুদ্ধি'[১] বলে উল্লেখ করেছিলেন, যাকে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকেই ইংরেজি অনুবাদের 'ডগমাটিজম' বলা হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ স্পষ্টতই বলেছিলেন, আমার মতটা ঠিক। আর তোমার মতটা ঠিক না— যাদের এই বুদ্ধি, তাদের হচ্ছে মতুয়ার বুদ্ধি।

'মতুয়ার বুদ্ধি' বলতে শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন; আমার ধর্মটি তোমার ধর্মের থেকে উৎকৃষ্ট— সেই বোধকে পরিহারের কথা। সর্বতোভাবে সেই বোধ পরিহারের উপদেশ মানবজাতিকে দিয়ে গিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর কথায় যতদিন এই মতুয়ার বুদ্ধি থাকবে, ততদিন অশান্তি থাকবেই। যুদ্ধ থাকবেই। হিংসা থাকবেই। অসহিষ্ণুতা থাকবেই। থাকবে যুদ্ধের ভয়। রক্তপাতের ভয়। হেরে যাওয়ার ভয়। হারিয়ে যাওয়ার ভয়। এই ভয় থেকেই আমাদের যত অশান্তি।

সেই ভয়ের সাম্রাজ্যকে যিনি বিস্তৃত করছেন সেই নরেন্দ্র মোদীকে, যে নরেন্দ্র মোদী, 'আমার ধর্ম শ্রেষ্ঠ', 'অপরের ধর্ম নিকৃষ্ট' এই বোধকে সামনে রেখে, গোটা ভারতবর্ষকে ধর্মের নামে, জাতপাতের নামে, বিভক্ত করে দিয়ে, রাজনৈতিক হিন্দুত্বকে চিরন্তন ভারতবর্ষের চিন্তা-চেতনার জায়গায় প্রতিষ্ঠা করতে চান, তাঁকে বেলুড় মঠের মঞ্চ ব্যবহার করতে দেওয়ার ভেতরে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের আদর্শকে কতখানি অবজ্ঞা, অসম্মান, অমর্যাদা করা হল— তা নিশ্চয়ই আলাদা করে বলার দরকার পড়ে না।

'বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে কে মোর আত্মপর! আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে কোথায় আমার ঘর'— 'বিদায়' কবিতার ভেতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, সেই বাণীকে মুক্ত করে দেওয়ার ভাবনা, সমন্বয়ী চিন্তা-চেতনার দ্যোতনার ভেতর দিয়ে বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের বুকে নতুনভাবে প্রবাহিত করতে পেরেছিলেন।

বিবেকানন্দ বলেছিলেন; 'গ্রহণই আমাদের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত— বর্জন নয়। কেবল পরমতসহিষ্ণুতার নয়— ওটি অনেক সময় ঈশ্বর নিন্দারই নামান্তর মাত্র; সুতরাং আমি ওতে বিশ্বাস করি না। আমি 'গ্রহণে' বিশ্বাসী। আমি কেন পরমতসহিষ্ণু হতে যাব? পরমতসহিষ্ণুতার মানে এই যে, আমার মতে আপনি অন্যায় করেছেন, কিন্তু আমি আপনাকে বেঁচে থাকতে বাধা দিচ্ছি না। তোমার-আমার মতো লোক কাউকে দয়া করে বাঁচতে দিচ্ছে— এরকম মনে করা কি ভগবানের বিধানে দোষারোপ করা নয়? অতীতে যত ধর্ম সম্প্রদায় ছিল, আমি সবগুলিই সত্য বলে মানি এবং তাদের সকলের সঙ্গেই উপাসনায় যোগদান করি। প্রত্যেক সম্প্রদায় যেভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করে, আমি তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে ঠিক সেইভাবে তাঁর আরাধনা করি। আমি মুসলমানের মসজিদে যাব, খ্রিস্টানদের গির্জায় প্রবেশ করে ক্রুশবিদ্ধ যিশুর সামনে নতজানু হব, বৌদ্ধদের বিহারে প্রবেশ করে বুদ্ধের ও তাঁর ধর্মের শরণ নেব এবং অরণ্যে গিয়ে সেই সব হিন্দুর পাশে ধ্যানে মগ্ন হব, যাঁরা সকলে হৃদয়-কন্দর-উদ্ভাসনকারী জ্যোতির দর্শনে সচেষ্ট।

'শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে যেসব ধর্ম আসতে পারে তাদের জন্যও আমার হৃদয় উন্মুক্ত রাখব। ঈশ্বরের গ্রন্থ কি শেষ হয়ে গেছে, অথবা তা কি চিরকাল ব্যাপী অভিব্যক্তি রূপে আজও আত্মপ্রকাশ করে চলেছে? জগতের আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তি সমূহের এই যে লিপি, এ এক অদ্ভুত গ্রন্থ। বাইবেল, বেদ ও কোরান এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ যেন ওই গ্রন্থের এক একটি পৃষ্ঠা এবং গ্রন্থটির অসংখ্য পৃষ্ঠা এখনও অপ্রকাশিত রয়েছে। সেইসব অভিব্যক্তির জন্য আমি এই গ্রন্থটি খুলেই রাখব। আমরা বর্তমানে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের অনন্ত ভাবরাশি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকব। অতীতে যা কিছু ঘটেছে, সে সবই আমরা গ্রহণ করব, বর্তমানে জ্ঞানালোক উপভোগ করব এবং ভবিষ্যতে উপস্থিত হবে তা গ্রহণ করার জন্য হৃদয়ের জানালা খুলে রাখব। অতীতের ঋষিকুলকে প্রণাম, বর্তমানের মহাপুরুষদের প্রণাম এবং যাঁরা ভবিষ্যতে আসবেন, তাঁদের সকলকে প্রণাম।' (Complete Works. Vol-2. Page-373-374)।

বিবেকানন্দের বাণীকে যে ব্যক্তি সর্বতোভাবে উপেক্ষা করে, অবজ্ঞা করে, অশ্রদ্ধা করে চিরন্তন ভারতবর্ষের প্রবাহমান সমন্বয়ী, বহুত্ববাদী চিন্তা-চেতনাকে, রাজনৈতিক হিন্দুত্বের একটি কৌনিক অবস্থানে রেখে বিচার করেন, সেই নরেন্দ্র মোদী এসে বেলুড় মঠের মঞ্চকে ব্যবহার করছেন তাঁর নগ্ন দলীয় স্বার্থে— এটা বিবেকানন্দকে চরম অপমান অমর্যাদা এবং অসম্মান।

বেশ কিছুদিন ধরেই বেলুড় মঠের সার্বিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে শাসনযন্ত্রকে তুষ্ট করবার একটা মানসিকতা ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠছে। বেলুড় মঠের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিশিষ্ট সন্ন্যাসীদের আমরা দেখতে পাচ্ছি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনিক

বৈঠকে মুখ দেখাতে। সেসব ছবি খবরের কাগজের পাতায় প্রকাশিত হচ্ছে।

অপরপক্ষে আরএসএস পরিমণ্ডলের সঙ্গে সংযুক্ত একটি বড়ো অংশের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে বেলুড় মঠের সন্ন্যাস জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে, অতীতে সংঘের বিভাজন মূলক দৃষ্টিভঙ্গি সেভাবে সংঘের ভেতরে সংক্রমিত করতে না পারলেও, বর্তমানে তাঁরা অত্যন্ত বেশি রকমের সক্রিয়। পূর্বাশ্রমে আরএসএসের শাখায় প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করা এক ব্যক্তি বর্তমানে বেলুড় মঠের অন্যতম দীক্ষাধিকারী। তিনি তাঁর চিন্তাভাবনা, মতাদর্শের ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদাদেবী, বিবেকানন্দের সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গি, মানবপ্রেম, হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির চিন্তা-চেতনা অপেক্ষা, গোলওয়ালকারের 'সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ' জনিত চেতনাকে বেশি মান্যতা দেন।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-এর বাণী বহুত্ববাদের ধারণা প্রসূত। রামকৃষ্ণ মিশনের কোনো রাজনৈতিক মতবাদ নেই, থাকতে পারে না। আমরা আশা করব রামকৃষ্ণ মিশন তার প্রণম্য প্রতিষ্ঠাতাদের মতবাদ মেনে ভারতের বহুত্ববাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে দাঁড়াবেন।

১) এখানে মতুয়া শব্দটি হুগলি জেলার একটি লোকায়ত শব্দ। এই শব্দটির সঙ্গে মতুয়া সম্প্রদায়ের কোনো সম্পর্ক নেই।

আতঙ্কগ্রস্ততা

তৃষিতানন্দ রায়

একজন চিকিৎসকের সঙ্গে সর্বস্তরের মানুষের যোগাযোগ বোধহয় সবথেকে বেশি হতে পারে। যোগসূত্র অবশ্যই রোগী ও তাঁর আত্মীয় পরিজনবর্গ। এক-এক ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয় করতে গিয়ে এমন অনেক কিছু জানতে পারি যা মনের মধ্যে গভীর দাগ কেটে যায়। অতি সম্প্রতি পরপর দুজন পরামর্শপ্রার্থী এলেন প্রায় একই কারণে। প্রথমজন এলেন সুদূর মালদহ থেকে। সমস্যা, মাস খানেক হল একদম ঘুম হচ্ছে না। হঠাৎ শুনে মনে হল এই সামান্য কারণে অতদূর থেকে স্নায়ুরোগ বা মনোরোগ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়াটা একটু তাড়াতাড়ি হয়ে গেল না। ভুল ভাঙল পরের কথাতেই। ভদ্রলোক জানালেন তিনি ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চের অল্প কিছুদিন পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করছেন। সরকারি চাকুরির মেয়াদান্তে অবসরও নিয়েছেন। ছেলেমেয়ে বড়ো হয়েছে। নিজস্ব সঞ্চয়ে একটা বসতবাটীও হয়েছে। অর্থাৎ নিশ্চিন্ত অবসর যাপনের সময়। তাঁর বয়স বর্তমানে চুয়াত্তর বৎসর। তিনি আরো জানালেন যে তাঁর ভারতীয় নাগরিকত্বের সব নথিও আছে। আশা করি সমস্যাটা আর পরিষ্কার করতে হবে না। প্রথম দিকে ভাবনা চিন্তা হতে হতে এখন তাঁর অবস্থা সর্বদা বুক ধড়ফড়ানি, দ্রুত গভীর শ্বাসপ্রশ্বাস, সারা গায়ে ঘাম, বুকে পেটে ব্যথা। অতি উচ্চ রক্তচাপ। এর থেকে মানুষের হার্ট অ্যাটাকও হতে পারে। এমনকী চাপ সহ্য করতে না পেরে আত্মহননের পথও বেছে নেয়। এসময়ে চারদিকে ঘটছেও তাই। একে বলে প্যানিক ডিসঅর্ডার। প্রথম প্রথম কোনো বিষয়ে একটু বেশি চিন্তাভাবনা বা Anxits State পরে অতিরিক্ত মাত্রায় পৌঁছলে Panic disorder বলা হয়। আজকের ইঁদুর দৌড়ের দুনিয়ায় এটি এমনিতেই একটি গভীর সমস্যা। যাই হোক ওঁকে অনেক রকম পরামর্শ বা counseling সহ কিছু ওষুধপত্র দিয়ে ফিরে যেতে বললাম। এঁর একজন পরেই এলেন এক ভদ্রমহিলা। থাকেন নদিয়া জেলার তেহট্টতে। ওঁর চিন্তাভাবনা বা anxits অনেক দিনের। আমি স্বগতোক্তির মতো বলেই ফেললাম পরপর প্রায় একই রকম সমস্যা। ভদ্রমহিলা আস্তে আস্তে বললেন, 'ডাক্তারবাবু, যার এক ছেলে কারগিল আর এক ছেলে বারামূল্লায় যেখানে আছে তার মায়ের কি ঘুম আসে?'। ভদ্রমহিলার সর্বদা মাথায় ব্যথা, উচ্চরক্তচাপ, অনিদ্রা ইত্যাদি। প্যানিক ডিসঅর্ডারের মতো থেকে থেকে বেড়ে ওঠে তীব্র যন্ত্রণা। সারাক্ষণ ধরে ছাইচাপা আগুনের মতো জ্বলতেই থাকে। এই অবস্থার নামও পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার বা সংক্ষেপে পিটিএসডি। আজকের দুনিয়ায় এটিও একটি নামজাদা অসুখ।

অল্পবিস্তর চিন্তা বা anxits আমাদের সকলেরই স্বাভাবিক শারীরিক প্রতিক্রিয়া। নিশ্চিন্ত-নিরূপদ্রব জীবন কাটাতে থাকলে মানুষের অগ্রগতি তো রুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু সবেরই তো মাত্রা থাকে। চিন্তা থেকে আতঙ্কে বা সরাসরি যখন তখন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন যাঁরা তাঁদের নিয়ে সমস্যা বেশি। পিটিএসডি অসুখের যন্ত্রণাই কি কম কিছু। কোনো ভয়ংকর ঘটনা চোখে দেখে বা উপলব্ধি করে বা কল্পনা করেও নিদারুণ মানসিক চাপ ও তজ্জনিত শারীরিক প্রতিক্রিয়ায় ভুগতে থাকে। সহজে ভুলতেও পারে না। নৈরাশ্য গ্রাস করে। মানুষে মানুষে সম্পর্ক রাখতে অসুবিধা হয় অর্থাৎ একাকিত্বও গ্রাস করে। ট্রমা বলতে যত না শারীরিক আঘাত তার অনেক বেশি মানসিক আঘাত বোঝায়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে মানসিক আঘাতের শারীরিক প্রতিক্রিয়া বা অনুভূতি কীভাবে ঘটে। মূল কারণ সংঘটিত হয় আমাদের ব্রেন ও শরীরের কোনো কোনো গ্রন্থিক-এ শতাধিক রাসায়নিক জোগান আছে। যাদের বলা হয় নিউরোট্রান্সমিটার। আধুনিক বিজ্ঞান যেমন আমাদের নতুন নতুন অসুখ শেখাচ্ছে, নতুন নতুন ওষুধ দিচ্ছে তেমনি সবকিছুর কার্যকারণ সম্পর্কও বুঝিয়ে দিচ্ছে। Scrotonin, Adrenaline, Noradrenaline, Dopamine, Acetyl Choline ইত্যাদির পরিচয় একেবারে অজানা নয়। এদের নিজেদের ভিতরে শরীরে একটা ব্যালান্স বা সামঞ্জস্যের ব্যাপার থাকে। অস্বাভাবিক অবস্থায় অর্থাৎ যে সমস্যাগুলোর কথা আগে লিখলাম সেই সব পরিস্থিতিতে

নিউরোট্রান্সমিটারগুলির ভিতরকার সামঞ্জস্য নষ্ট হয়। তার ফলস্বরূপ Anxits বা PTSD.

এতক্ষণে আপনাদের কারো মনে হতে পারে হঠাৎ করে ভয়, ভীতি বা আতঙ্ক নিয়ে পড়লাম কেন। ধরা যাক ২০১৬ সালের ৮ নভেম্বর অন্যান্য দিনের মতো কাজ সেরে বাড়ি ফিরে টেলিভিশন সেটটা খুলে দেখি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সবিস্তারে নোট-বন্দির কথা বলে চলেছেন। গান্ধি সিরিজের ৫০০ টাকা, ১০০০ টাকার সব নোট দেশজুড়ে বাতিল করে দিয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। ঘোষণা করছেন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। আর কেউ নয়। সেটাই কি অত্যন্ত ভীতিজনক নয়। তার মানে আমার কাছে আপনার কাছে দিনগুজরানের যা টাকা পয়সা আছে সব অচল। এক মুহূর্তে বাতিল হয়ে গেল, অচল হয়ে গেল। অন্তত কিছুক্ষণের জন্য একটা হাড়হিম করা অবস্থা নয়? তবে কিছু সময় তো দিতেই হবে। পুরোনো নোট ফেরত দিয়ে নতুন নোট ব্যাঙ্ক থেকে নিতে কিছু সময় তো দিতে হবে। এত বড়ো কাণ্ড দেশজুড়ে ঘটল কিন্তু কয়জন আগাম বুঝতে পেরেছেন? আজও কি সবকিছু পরিষ্কার? কিন্তু সারা দেশজুড়ে যে হঠাৎ করে নেমে আসা অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট আমরা দেখলাম। ব্যাঙ্কে ঘন্টার পর ঘন্টা লাইন দিয়েও টাকা পাওয়া যাচ্ছে না; নতুন টাকার জোগান অপর্যাপ্ত। লাইনে দাঁড়িয়ে কেউ কেউ মূর্ছা যাচ্ছেন, এমনকী মারাও গিয়েছেন। ব্যাঙ্ক কর্মচারীরাও দিবারাত্র কাজ করে অসুস্থ হয়ে পড়লেন বা গোলমালে পড়ে চাকরিও খোয়ালেন। নতুন নোটের বিশেষ করে ছোটোনোটের আমদানির অপ্রতুলতায় ক্ষুদ্র, মাঝারি চাষিরা, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণের দুর্ভোগের কাহিনির শেষ নেই। প্রসঙ্গতর নোটবন্দির কিছু আগেই এসেছে জিএসটি। যার ফলে এই সব গরিব মানুষেরা আগে থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত, চিন্তা ভাবনায় নিমগ্ন।

এবার আসি ২০১৯-এর জাতীয় নাগরিক পঞ্জীকরণ বা এনআরসি। যদিও শুরু হল অসমে, অসমের জন্যই তৈরি পুরনো বিধিকে বৈধতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হল। ১৯৫১ সালে এনআরসি তৈরি হয়। অসমে জন্মগ্রহণকারী বাঙালিদের থেকে অন্যদেশ মূলত বাংলাদেশে জন্মগ্রহণকারী বাঙালিদের পৃথকীকরণ করা ও দেশ থেকে বিতাড়নের কথা ছিল। পরে সময়সীমা পিছিয়ে ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চ মধ্যরাত্রের সময়সীমা অর্থাৎ বাংলাদেশ যখন পাকিস্তান থেকে স্বাধীন ঘোষণা করে দিল সেই সময়কে cut of point's ধরা হল। অথচ ভারত-বাংলাদেশ শতছিদ্র সীমারেখার মধ্যে কতজন যাতায়াত করছে রাজনৈতিক দলগুলির স্বার্থে, নাগরিকত্ব লাভ করেছে, এদেশে বসবাস করছে। এনআরসি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের দেশের বাইরে পাঠানোর চেষ্টা শুরু হল। তার সঙ্গে সারাদেশে বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এনআরসি করা হবে বলে ঘোষণাও হল। পরিস্থিতি বুঝে পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে আসা সর্বশেষ মানুষকে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। মুসলমানের উল্লেখ নেই। যা খুশি করো। কার্যত কী হল সবাই দেখছেন, জানছেন। টাইপিস্টের ভুলে, এমনকী ট্রাইবুনালেরও ভুলে উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে পড়ল। ৩৬ বছরের সুব্রত দে সুবোধের বদলে ডিটেনশন ক্যাম্পে প্রাণ দিল বিদেশি বলে। নয় দিন পরে 'বিদেশি' সুব্রতর দেহ দেওয়া হল তার 'স্বদেশি' স্ত্রী কামিনীর কাছে সৎকারের জন্য। সব লিখলে একটি বই হয়ে যাবে। ২০১৯ সালেই দেখলাম সংসদের উভয় কক্ষে ঝড়ের বেগে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ হয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাননীয় রাষ্ট্রপতির সইও হয়ে গেল। রাতারাতি বিল থেকে আইন হয়ে গেল।

এরপর আসছে জনগণনাও সঙ্গে জাতীয় জনপুঞ্জি বা এনপিআর। সবই সময়সীমা বেঁধে দিয়ে ২০২০-২০২১-এর মধ্যে।

এর মধ্যে হয়ে গেল কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিল। লাগাতার কারফিউ, সারাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে, কতজনকে আটক করে— যে ভাবেই হোক। কথা রাখতে হবে। এই না হলে গণতন্ত্র। সাধারণ মানুষের মতামত জানাবার কিছুই যেখানে থাকবে না। নাহ্ একে গণতন্ত্রে বলে না। গণতন্ত্রে শেষকথা বলে জনগণ জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের সর্বস্তরে যারা আজ রাস্তায়, মাঠে, ময়দানে, আমরা সবাই সেখানে। গুটিকয়েক অত্যাচারী বিপুল দেশবাসীকে একধরনের পরিবেশ দূষণের মাধ্যমে ভয়ভীতির সঞ্চার করে Anxits বা Panic অসুখে কতটুকু ভোগাতে পারে।

বাস্তুচ্যুতি ও দেশান্তরী কান্নার বীজ

গৌতম গুহ রায়

আইলান, ফেলেনি ও নিশ্চুপ বিশ্ববিবেক

দুটো শিশু, আইলান কুর্দি ও ফেলেনি, মাঝে নিঝুম অর্ধেক বিশ্ব। রাষ্ট্র কখনো কখনো ধাতব, শীতল যন্ত্র হয়ে যায়। তার সীমান্ত থাকে, দখলের ও রক্ষার অস্ত্রও থাকে, সংবেদনহীন এই যন্ত্র ক্ষমতা ও জনতার দ্বন্দ্বে ক্ষমতার কাঁধে কাঁধ রাখে। রাষ্ট্রীয় অহংকার তার সীমা, তার কাঁটাতার ও সীমান্ত। এই অহংকারের ধুসর অন্ধকারে নিস্তব্ধ পড়ে থাকে মানবিক সৈকত, দুই বেয়নেটের মাঝে সবুজ চাষজমি দুফালা করে খাঁড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কান্নার কাঁটাতার। তাই বিশ্বের মানুষ দেখে ওই ছবিগুলো, আমরা দেখি প্রতিকারহীন ন্যুব্জ মানুষের মূকমিছিল। ২৫ মার্চ ২০১৫, ভূমধ্যসাগরের ভেজা বালুর উপর মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে বছর তিনেকের একটি নিস্পন্দ নিথর শিশু দেহ, আইলান কুর্দি। ৭ জানুয়ারি ২০১১, পনেরো বছরের মেয়ে ফেলেনি খাতুনের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর গুলিতে বিদ্ধ দেহ ঝুলছে বর্ডারের কাঁটাতারে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দুই দেশ, একই ভাষা ও সংস্কৃতির, একই ঐতিহ্যের অংশীদার দুই দেশ, ভারত ও বাংলাদেশ, এদের মাঝের অমানবিক কাঁটাতারের উপর সীমান্তের অমানবিক বুলেটের ক্ষত নিয়ে ঝুলতে থাকে ফুলের মতো একটি মেয়ে ফেলেনি। আমরা অনুভব করি মানুষ কেমন ক্রমশ তার বিবেকের জমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উদ্‌বাস্তু হয়ে গেছে, এক মনহীন ধাতব যন্ত্র অনুগত রোবট, ভালোবাসার মাটি থেকে উৎপাটিত হয়েছে তার শেকড় শুধু নয়, ক্রমশ পুড়ে যাওয়া মননের নন্দন কাননেও কীভাবে সে হয়ে যায় উদ্‌বাস্তু।

আভিধানিক অর্থে উদ্‌বাস্তু বলতে আমরা বুঝি বাস্তুহীন বা ভিটাচ্যুত মানুষদের। সভ্যতার ইতিহাসে মানুষের প্রব্রজন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, এর ফলেই সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিস্তার ঘটে। ইতিহাসের সেই স্বাভাবিক প্রব্রজন ঘটে নানা কারণে, প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক নানা কারণ থেকে। কিন্তু উদ্‌বাস্তু মানুষেরা তাদের ভিটা বা আদি জন্মস্থান থেকে উৎপাটিত হয় রাজনৈতিক হানাহানির পরিণামে, রাষ্ট্র ক্ষমতার দখলদারি এর পেছনে প্রধান ভূমিকা নেয়। অ্যাগাম্বেন তাঁর 'থিয়োরি অব দ্য বাউন্ডস' এ লিখেছেন, 'উদ্‌বাস্তু সমস্যাকে প্রায়শই ভুলবশত মানবিক সমস্যা বলে ধরা হয়, কালাতিক্রমী রাজনৈতিক সমস্যা নয়'। অ্যাগাম্বেনের মতে রাষ্ট্র ও জনের মধ্যেকার সংঘাতের ফলে জন'কে 'অবৈধ' তকমা দেওয়া হয় এবং এমনই এক উদ্‌বাস্তু ধারণা তৈরি করা হয় যা টোপোগ্রাফিক্যাল-এর চেয়ে বেশি টোপোলজিক্যাল।

রাষ্ট্র ধারণার প্রত্যুষ থেকেই সীমান্তরেখা জড়িয়ে আছে। সীমান্তকে রক্ষা ও বৃদ্ধি রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কিত। অয়ারেন্টের মতে, রাষ্ট্রহীনতার সমস্যা কোনো বস্তুনির্ভর সমস্যা নয়, বরং রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্য থেকেই এর জন্ম। আমরা দেখি মহাভারতে পিতামহ ভীষ্ম বলছেন, 'দেশের সীমা মায়ের বস্ত্রের সমান। অতএব সীমা রক্ষা করা পুত্রের প্রথম কর্তব্য'। এই দেশ কর্তব্য ক্রমশ পর্যবসিত হয়ে ওঠে আগ্রাসী সম্প্রসারণ, হানাহানি ও প্রাণঘাতী সংঘাতে। এই সীমান্তরেখায় এসে জাতীয়তাবোধ উশকে দেয় বৈরী-মনকে, মিত্র নিমেষে হয়ে যায় শত্রু। এ এক দীর্ঘকালের পরম্পরা। এই শত্রুতার ফলে যে সংঘাত জন্ম দেয় তার পরিণামে সংকটাপন্ন হয় মানুষ, প্রসারমান আতঙ্কে ভিটে মাটি থেকে সে পালিয়ে যায়। দলে দলে মানুষের এই পালানোই বলপূর্বক প্রব্রজন। মানুষ আনন্দের শেকড় ছিঁড়ে পালায় না, সে অসহায় হয়ে বাধ্য হয়েই প্রব্রজন করে। কারণ যুগ যুগ ধরে গড়ে ওঠা যে জনসংস্কৃতির অংশ তিনি হয়ে ওঠেন তার থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তাঁকে অনেক কিছুই হারাতে হয়, শুধু ভূমি বা সম্পত্তি নয় হারাতে হয় নিজের পরিচয়, সংস্কৃতিও। জনসংস্কৃতি 'মানবের দৈনন্দিনতা থেকে হৃদয়বত্তা, মনন চর্চা হতে ক্রীড়ানুশীলন, ধর্ম, সংস্কার, অভ্যাস। এমনকী খাদ্যাভাস থেকে পোশাক-পরিচ্ছদ— সবকিছুই এর পরিসীমাভুক্ত। বলতে গেলে জনসংস্কৃতি হল মানবসভ্যতার উজ্জ্বল দর্পণ। যেখানে প্রতিনিয়ত প্রতিফলিত হয় মানুষের নানাবিধ চিন্তা-চেতনা ও আচরণসমূহ যেগুলি সে রপ্ত করে, আদানপ্রদান করে ও সর্বোপরি বহন করে নিয়ে চলে এক প্রজন্ম হতে অন্য প্রজন্মে'। এই নিবিড় বন্ধনকে

ভেঙেচুরে তাকে চলে যেতে হয়। এই যন্ত্রণা একমাত্র ভুক্তভোগী 'উদ্‌বাস্তু'ই জানেন, তাঁর প্রজন্ম সেই যন্ত্রণা বহন করে বা করে না।

স্বাধীনতার নামে দেশ ভাগ এই বাংলার, বিশেষ করে সীমান্তের মানুষদের সামনে অনেক যন্ত্রণার জন্ম দিয়েছে, ছিট মহল সমস্যা, এয়াডভার্স পজিশান সমস্যা, কাঁটাতারের বেড়ার সমস্যা, নো ম্যানস ল্যান্ডের মানুষদের সমস্যা। এর প্রধান কারণ সীমান্তরেখা যিনি এঁকেছিলেন সেই সিরিল র‍্যাডক্লিফ ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা। স্বপ্নভূমের আশায় লক্ষ লক্ষ মানুষকে ভূমিচ্যুত করা হল একটি খড়ির গণ্ডি কেটে। মাত্র ছত্রিশ দিন সময় দেওয়া হয় র‍্যাডক্লিফকে দুই দেশের সীমান নির্ধারণের জন্য, এর আগে তিনি এই দেশটি চিনতেন না, আসেননিও কোনোদিন। এই ছত্রিশ দিনে তিনি একবারের জন্যেও বাংলা বা পাঞ্জাব দেখতে পাননি। বিলাতের কৃতি আইনজীবী র‍্যাডক্লিফ দিল্লিতে বসে মাত্র চার ঘণ্টায় দুই দেশের সীমান্তরেখা টেনে দেন। এই কাজে তাঁর সহায়ক ছিলেন ভাইসরয়ের সচিব ভি পি মেনন। ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন নীতি গ্রহণ করা হলেও তা কতটা অবদি প্রসারিত হবে তা এঁদের কাছে পরিষ্কার ছিল না, ছিল তাড়াহুড়ো। যতদ্রুত এই দেশটাকে দ্বিখণ্ডিত করা যায়! এই পরিণাম লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর সামনে এক ভয়ানক অন্ধকারের বাস্তব। ১৯৪৭-এর ৩ জুলাই এই র‍্যাডক্লিফ বিভাজন চূড়ান্ত ভাবে গ্রহণ করা হল। কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ এই উভয় দলের নেতাদের সঙ্গে শাসক ব্রিটিশের দীর্ঘ কথপোকথন ও দর-কষাকষির পর দেশভাগ ও স্বাধীনতার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই দুই ঘটনা একযোগে আইনি মান্যতা পায় ব্রিটিশ সংসদে পাশ হওয়া 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাক্ট ১৯৪৭ এর মাধ্যমে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে প্রধানমন্ত্রী আয়াটলি এই মর্মে বিল পাশ করেন ৪ জুলাই ১৯৪৭। বিলট পাশ হয় ১৫ জুলাই। উচ্চকক্ষে পাশ হয় ১৬ জুলাই। এর পর ১৫ আগস্টের মধ্যরাতে তথাকথির সূর্যোদয়! লক্ষ লক্ষ মানুষের উদ্‌বাস্তু জীবন।

'নীড় হারা পাখির গান'

বাধ্যতামূলক প্রব্রজন বা উদ্‌বাস্তু হয়ে মানুষের ভিন্ন আস্তানার উদ্দেশে ছুটে চলার ঘটনার প্রাচীন উদাহরণ সেদিনের মধ্যপ্রাচ্যে দেখা যায়, ঘটনাক্রমে আজকের দিনেও সেই অঞ্চলেই উদ্‌বাস্তু হয়ে ভিটাচ্যুতির ঘটনা মর্মান্তিক বাস্তবতা হয়ে দেখা দিচ্ছে। মিশর, সিরিয়া ও আরব অঞ্চলের মধ্যবর্তী ভূমধ্যসাগরের পারের ভূখণ্ডটি চিরকালই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের তিনটি প্রধান ধর্মের সূচনা ক্ষেত্র এটি, ইসলাম, খ্রিস্টান ও জুডাইজম। যুগ যুগ ধরে নানা মতের ও রাষ্ট্রের সংঘাতে রক্তাক্ত হয়েছে এই অঞ্চল। মানুষ প্রাণ বাঁচাতে দেশান্তরী হয়েছেন। খ্রীস্টিয় প্রথম শতকে রোমান সম্রাট টাইটাসের নির্মম অত্যাচারের বলি হয় স্থানীয় ইহুদিরা। এক চতুর্থাংশ ইহুদিকে হত্যা করা হয়, অনেককে ক্রীতদাস করে রোমে নিয়ে যাওয়া হয়। গৃহচ্যুত ইহুদিরা ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপের নানা দেশে। বাধ্যতামূলক প্রব্রজনের এটি এক নির্মম উদাহরণ। এর পরের মর্মান্তিক উদাহরণ আফ্রিকার মানুষেরা। ইউরোপীয় ভাগ্যান্বেষীরা আফ্রিকা থেকে মানুষদের ক্রীতদাস করে চালান দিতে শুরু করে আমেরিকা, লাটিন আমেরিকা ও ইউরোপের নানা দেশে। সভ্যতার যাবতীয় শর্ত লঙ্ঘন করে এই মানুষদের জন্তুর মতো নিজ গৃহ থেকে বলপূর্বক তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৮২১ থেকে ১৮৩০, এই এক দশকের প্রত্যেক বছর গড়ে প্রায় ৮০/৮৫ হাজার কালো মানুষকে ক্রীতদাস করে চালান করা হয় আমেরিকা, লাটিন আমেরিকা সহ নানা দেশে। এই মানুষদের 'উদ্‌বাস্তু জীবন'-এর বর্ণনা সভ্যতার সবচেয়ে নির্মম আখ্যান, যা সত্যি ও বাস্তবে ঘটেছিল। প্রায় তিন শতাব্দী ধরে এই অমানুষিক ঘটনা ঘটে চলে ইউরোপীয় 'সভ্য'দের হাতে। ১৮৬৫-তে আব্রাহাম লিংকনের উদ্যোগে দাস প্রথা আইনি ভাবে নিষিদ্ধ হয়। আজ আমেরিকা ও লাটিন আমেরিকার অধিকাংশ অধিবাসী আফ্রিকা ও এশিয়ার উপনিবেশ থেকে, তাদের নিজ ভিটে থেকে উচ্ছেদ করা মানুষের বংশধর, একদিন বলপূর্বক যাদের ভূমিচ্যুত করা হয়েছিল।

ডিজিটাল বিশ্বের উপহার পরিবার ভেঙে মানুষের একক হয়ে যাওয়া। মানবাত্মার ক্রমবর্ধমান বিপন্নতা, পুঁজি ও ভোগবাদ যেমন মানুষকে নিঃসঙ্গ করছে, তেমনি মানবিকতার মোড়ক মুক্ত করেছে রাষ্ট্রের লালসাকে। গত শতকের দু-দুটো সভ্যতাঘাতী বিশ্বযুদ্ধ অতিক্রম করে আসা মানুষ আশা করেছিল এবার হয়তো শান্তি কায়েম হবে, কল্যাণকামী রাষ্ট্রর হাতে বিশ্ব কিছুটা স্বস্তিতে থাকবে। কিন্তু বাস্তব চেহারাটা হয়ে উঠছে আরো ভয়ানক, পুঁজির দ্বন্দ্বে পিছু হটছে মানবিক সুস্থিতি, আহ্বান করে আনা হচ্ছে আরো ভয়ানক এক সময়কে। জাতিসত্তার নামে খণ্ডীকরণ, ধর্মীয় জিঘাংসায় সদা ব্যাপ্ত ধ্বংসের দুন্দুভি গোটা সভ্যতাকে এক মানবিকতা বিহীন ধূসর প্রান্তরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। যুযুধান অপশক্তির দাপটে মানুষ হারাচ্ছে তার অস্তিত্বের শেকড়, তার বিশ্বাসের জমি। সীমান্তের খড়ির গণ্ডি মানুষকে রাষ্ট্রহীন করছে, আজকের সময়ে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হয়ে উঠছে সীমান্ত রেখাকে নিয়ে। যে রেখার দুপারে জমা হচ্ছে সব হারানো মানুষের কান্নার নকশিকাঁথা।

'একজন মানুষকে যে বাঁচায়, সভ্যতাকে সে রক্ষা করে'

স্পিলবার্গের 'সিন্ডার'স লিস্ট'-এর শেষ দৃশ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্ব। কনসেনট্রেশান ক্যাম্পের মরণ কামড় থেকে বেঁচে

যাওয়া ইহুদিদের পক্ষ থেকে তাদের প্রাণদাতা জার্মান সিন্ডারের হাতে একটি আংটি পরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে ফেরা এক ইহুদির বাঁধানো দাঁতের সোনা দিয়ে বানানো সেই আংটিতে খচিত আছে, 'একজনের প্রাণ যে বাঁচান, তিনি গোটা বিশ্বকেই রক্ষা করেন'। আবেগের চোখে জল নিয়ে সিন্ডার আফশোস করেন যে তাঁর হাতে আরো টাকা থাকলে তিনি আরো কয়েকজন ইহুদিকে রক্ষা করতে পারতেন। সিনেমায় দেখি ব্যর্থ ব্যবসায়ী সিন্ডার যুদ্ধের সেনাদের শিবিরের জন্য অস্ত্র ইত্যাদির বরাদ্দ নিয়ে পোল্যান্ড এসেছিলেন। তিনি তাঁর কারখানার কাজে পোলিশদের বদলে ইহুদিদের নেন, কারণ সস্তায় তাদের শ্রম কেনা যাবে, আর একটি গোপন উদ্দেশ্য কনসেন্ট্রেশান ক্যাম্পের কবল থেকে বা অত্যাচার ও মৃত্যু থেকে তাঁদের রক্ষা বাঁচানো। শেষ দিকে যুদ্ধের গতি জার্মানদের প্রতিকূল হচ্ছে দেখে জীবিত ইহুদিদের কনসেন্ট্রেশান ক্যাম্পে পাঠানোর আদেশ আসে। সিন্ডার আবার এসএস বাহিনীকে ঘুস দিয়ে তাদের রক্ষা করেন। তিনি জানান যে এই কর্মীদের তাঁর গ্রামের কারখানায় নিয়ে যাবেন, সেই অনুযায়ী শ্রমিকদের একটি তালিকা বানান ও ট্রেনে তুলে দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেই ট্রেন ভুল করে আউসভিজ পৌঁছায়। সেখানে ছুটে যান সিন্ডার। শ্রমিকদের ছেড়ে দিলেও এসএস বাহিনী শিশু ও মহিলাদের আটকে দেয়, তখন সিন্ডার তাদের বলেন যে শিশুদের সরু হাতে বন্দুকের নল পরিষ্কারের কাজে সুবিধা হয়। এক থলে হিরে ঘুষ দিয়ে এ যাত্রায় তাদের রক্ষা করেন। যুদ্ধে জার্মানদের পরাজয় হয়। এস এস গার্ড ইহুদিদের মেরে ফেলতে বলে, কিন্তু সিন্ডার ইহুদিদের মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন। সবার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় এলে কর্মীরা তাদের ভালোবাসার চিহ্ন স্বরূপ উল্লেখিত আংটিটি দেয়।

ছবিতে দেখা যায় রেড আর্মির তত্ত্বাবধানে ইহুদিরা মুক্ত হয়। আমরা জানতে পারি সিন্ডার পোল্যান্ডের চার হাজার ইহুদিকে রক্ষা করেছিলেন। সিনেমাটির শেষে লেখা থাকে 'নিহত ছয় হাজার ইহুদির স্মরণে'।

আজকের ভারতের মাটিতে এই কাহিনির উল্লেখ প্রাসঙ্গিক এই কারণে যে আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্র ক্রমশ ফ্যাসিস্টদের কবজায় চলে যাচ্ছে। ধর্মের পরিচয়ে, বর্ণের পরিচয়ে ভাঙনের এক অন্ধকারের বলয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ভারতবর্ষকে। গত শতাব্দীতে ঘটে যাওয়া বিশ্বের সবচেয়ে মর্মান্তিক ও আত্মঘাতী সংঘাতের বারুদগন্ধি মাঠে কীভাবে বর্ণ ও ধর্মের পরিচয়কে অতিক্রম করে জয়ী হয় মনুষত্ব সেই কাহিনি আজকের দিনে দিশা হতে পারে। যখন এদেশে সংবিধানের বর্মকে তছনছ করে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন তৈরি হচ্ছে। আবার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপছন্দের নাগরিকদের রাষ্ট্রহীন করার চেষ্টা হচ্ছে। গড়ে তোলা হচ্ছে কনসেন্ট্রেশান ক্যাম্পের আদলে 'ডিটেনশান ক্যাম্প'। দেশভাগে বাস্তুভিটা থেকে চ্যুত হওয়া লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে আবার জাগছে শেকড়হীন হওয়ার আতঙ্ক। এই দেশের হাজার বছরের বহুত্ববাদী সামাজিক বুনন আজ ছিন্নভিন্ন হওয়ার পথে। এই সময় তাই সমস্ত শক্তি দিয়ে মানবতার পক্ষে মুষ্টিতে মুষ্ঠিতে বন্ধনে বাঁধা পড়ার সময়, যেখানে খচিত থাকবে মানবতার আর্তি 'একজন মানুষকে যে বাঁচায়, সভ্যতাকে সে রক্ষা করে'। সামাজিক বুননকে রক্ষা করাই আজকের চ্যালেঞ্জ। শেকড়চ্যুত, উদ্‌বাস্তু হওয়ার থেকে মানুষকে রক্ষা করাও ততধিক গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের, এই ভারতীয় সমাজের সবচেয়ে গভীর ক্ষত দেশ ভাগ, ফল স্বরূপ শেকড় থেকে উৎপাটিত কোটি কোটি মানুষের বাস্তুচ্যুত হওয়া। এই 'উদ্‌বাস্তু জীবন'-এর ক্ষত আজও স্বাধীনতা অর্জনের মধ্যরাতের সূর্যোদয়ের অভিঘাতে 'উদ্বাস্তু' হয়ে যাওয়া সেই সব মানুষের সবচেয়ে দুঃসহ স্মৃতি, যে যন্ত্রণা এই প্রজন্মও বহন করছে। কিন্তু, এর বিপরীতে এটাই সময়ের বাস্তবতা যে মানুষের স্মৃতি সততই উদ্বায়ু, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা ফিকে হয়ে আসে। এই ধূসর স্মৃতির সখাত সলিলে নিমজ্জিত ভাঙা ভূমির বাঙালির সামনে আজ চক্রব্যূহের ফাঁদ। এই ফাঁদে পড়ে আজ সে বিস্মৃত তার হাজার বছরের ঐতিহ্য। সে আজ হিন্দু বা মুসলমান। তার স্মৃতি থেকে বিস্মৃত হয়ে গেছে দেশভাগ, দাঙ্গার তাজা রক্তে স্নাত ভূমি, বাস্তুহীনতার অভিশাপ তাড়িত সে ধর্মের নামে আত্মঘাতী চক্রব্যূহে আবার ঢুকে পড়েছে। জাতীয়তার আবেগে বিপন্ন মানবিকতার দগ্ধ প্রান্তরে ক্রমশ পথ হারাচ্ছে এক প্রজন্মের উদ্‌বাস্তু, প্রবল হয়ে উঠছে দিশাহীন বাঙালি ভেতরের আন্তর্বিরোধ ও কেন্দ্রীকতার অপরতার নির্মাণ।

স্বাধীনতার তীব্র আন্দোলনের সামনে অসহায় ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রশক্তি দেশ ভাগের দুর্যোগ নামিয়ে এনেছিল। ক্ষমতা দখলের মৌতাতে মগ্ন জাতীয় নেতৃত্ব তখন বিভাজন প্রতিরোধের থেকে ক্ষমতার অলিন্দে পৌঁছানোকে বেশি জরুরি মনে করেছিলেন। অপ্রধান হয়ে পড়ে ব্রিটিশ শক্তির বহুমুখী ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার লড়াই। সূক্ষ্মভাবে শাসক সাম্প্রদায়িক বিভাজনকে ত্বরান্বিত করার জন্য বাংলা ও পাঞ্জাবকে বেছে নেয়। এখানে উল্লেখ প্রয়োজন যে শুধু বাংলার পশ্চিম সীমা নয়, উত্তরের আসাম সংলগ্ন সিলেটকেও ভাগ করা হয়েছিল, যার পরিণতি আরো মর্মান্তিক হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের জমি বাংলায় ও পাঞ্জাবে শক্ত ছিল সবচেয়ে, তাই এখানেই আঘাত হানল তারা। ১৯৪৬-এর গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং, ১৯৪৯-এর দাঙ্গার নৃশংস গণহত্যা, হাজার বছরের অবিভক্ত দুই জাতিকে ভেঙে টুকরো করে ফেলার চক্রান্ত তখন মুখ্য হয়ে উঠল। বাংলার বিভাজনের ফলে পৃথিবীর পাঁচটি বৃহৎ ভাষাগোষ্ঠীর অন্যতম বাঙালি বিচ্যুত হল তার ইতিহাস-সংস্কৃতি-সাহিত্যের

ধারাবাহিকতা থেকে। মানুষের ভূমিচ্যুত রাষ্ট্রচ্যুত হওয়ার থেকে কম বেদনার নয় এই চ্যুতি। দেশ ভাগ স্মৃতিচ্যুত আমাদের সবচেয়ে বড়ো ক্ষত। বিভক্ত জার্মানি এই ক্ষতের উপসম ঘটিয়ে এক হয়েছে, কারণ তাদের ভৌগলিক সীমান্তের কাঁটাতারে সংস্কৃতির বিভাজন ঘটাতে পারেনি। এই বিভাজনের অনুঘটক ধর্মের পরিচিতিকে সবার উপর তুলে ধরে, যেটা আমাদের বাংলায় করা হয়েছে, চতুর ভাবে। আমাদের বিভাজন রেখা আমাদের মনে স্থায়ী ফাটল হয়ে আছে। তাই আমরা মননের ভূমিতেও চির উদ্‌বাস্তু। ব্যক্তি আমি বায়লজিক্যালি ভারতে জন্মালেও আমার চেতনায় উদবাস্তু সত্তার ছায়া বহমান। বহু প্রজন্মের ভিটা থেকে উৎপাটিত মানুষকে একটি সীমান্ত চিহ্ন দিয়ে উদ্‌বাস্তু অভিধায় অভিহিত করা হয়। নতুন স্বভূমির স্বপ্নকল্পের মোহে ধর্মীয় পরিচিতির করাল গ্রাসে নিমজ্জিত বাঙালির অধিকাংশ জনতা সেই ভয়ানক মাহেন্দ্রক্ষণে দেশ ছেড়ে চলে এলেন। কেউ পূর্ব থেকে পশ্চিমে কেউ পশ্চিম থেকে পুবে। চিরকালের মতো উৎখাত হলেন সাত পুরুষের ভিটা থেকে, নিরাপদ দূরত্বের আসন থেকে চেহারা পালটানো শাসক নির্বিকার চিত্তে এই মহা বিপর্যয় দেখলেন। আর কোটি কোটি বাঙালি উদবাস্তু হয়ে এলেন বা গেলেন। একটা হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে প্রায় ১ কোটি ১২ লক্ষ মানুষ পশ্চিম প্রান্তে দেশ ছাড়তে বাধ্য হন, ৪৭ লক্ষ হিন্দু ও শিখ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ভারতে আসেন, ৬৫ লক্ষ মুসলমান ভারত থেকে পাকিস্তানে গিয়েছিলেন। ৩৩ লাখ মানুষ পূর্ব প্রান্তে আদান প্রদান হয়েছিল, এঁদের মধ্যে ২৬ লক্ষ হিন্দু পূর্ব পাকিস্তান থেকে এসেছিলেন, ৭ লক্ষ ভারত থেকে পূর্ব পাকিস্তানে আশ্রয় নেন। এই বিপুল সংখ্যক মানুষের, বাঙালির কোথায় স্থায়ী ঠিকানা হবে, দণ্ডকারণ্য নাকি আন্দামান, নাকি সুন্দরবন অথবা এই বাংলাতেই নতুন শেকড় খুঁজে নেবেন তাঁরা! উদ্‌বাস্তু শিবির, রিডিউজি ক্যাম্প থেকে পিলপিল করে অসহায় মানুষ খুঁজতে থাকলেন মাথা গুঁজে বাঁচার নূন্যতম আস্তানা। এক ভয়ানক ও হৃদয়বিদারক আখ্যান রচিত হল কোটি কোটি মানুষের এই প্রব্রজন অভিযাত্রায়। এখনও বেঁচে থাকা সেই সব মানুষের নিকটস্থ হলে সেই চাপা কথার আওয়াজ শোনা যায়। যে কথা ধরে রেখেছে আমাদের সাহিত্য, আমাদের থিয়েটার, আমাদের চলচ্চিত্র। তবুও প্রকৃত বাস্তবতার তুলনায় তা খুবই নগণ্য। বাংলা ও বাঙালির অধিকাংশের উপর নেমে আসা এই বিপর্যয়ের চিত্র ও অনুভব আমাদের চেতনায় সেভাবে ছাপ রেখেছে কি? নব প্রজন্মের সামনে আজ সেই রক্তস্নাত অতীতের এটাই জিজ্ঞাসা। উত্তর সীমান্তের শ্রীহট্ট এই দেশ ভাগের পরবর্তীতে সবচেয়ে বিপন্ন ভবিষ্যতের সঙ্গে যুঝেছে এবং যুঝে চলেছে এটা ঘটনা। আমরা সুজিত চৌধুরীর স্মৃতিকথায় দেখি: 'আমরা জন্মেছিলাম ভারতবর্ষে, পরে জানলাম সেটা আর ভারতবর্ষ নয়। এবারে তাই আবার ছুটছি নতুন ভারতবর্ষের সন্ধানে। রাজনৈতিক ভূগোলের ভারতবর্ষে আমরা ঢুকলাম আধঘণ্টার মধ্যেই কিন্তু পিতৃপুরুষের স্বপ্নের ভারতের সন্ধান এখনও চলছে।'

ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করার বেশ কয়েক বছর আগে ইউরোপের গ্রিস ও তুরস্কের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী এক বিপুল সংখ্যক মানুষকে দেশান্তরিত হয়ে উদ্‌বাস্তু জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছিল। ১৯২৩ সালের ৩০ জানুয়ারি সুইজারল্যান্ডের লুসানে গ্রিক ও তুর্কি জনগণের প্রত্যর্পণ চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী ২০ লক্ষ মানুষ স্থানান্তরিত হন। এই 'কনভেনশ্যান কনসার্নিং দ্য এক্সচেঞ্জ অফ গ্রিক অ্যান্ড টার্কিশ পপুলেশানস' অনুযায়ী ১৫ লক্ষ এয়ানাটোলিয়ান গ্রিককে তুরস্ক ছাড়তে হয়, অন্যদিকে ৫ লক্ষ মুসলিমকে গ্রিস থেকে চলে আসতে হয়। এই চুক্তির পেছনে ক্ষমতাশীল শক্তির স্বার্থ ছিল, দেশ ছাড়তে বাধ্য হলেন জনতা, ধর্মীয় পরিচিতিতে আবার জার্মানির দিকে তাকালে দেখি ১৯৩৫-এর আগে ন্যুরেম্বার্গ ল' জার্মানদেরকে দুভাগে ভাগ করে রেখেছিল— রাজনৈতিক অধিকার সংবলিত এবং বিহীন নাগরিক। এই ধরনের নীতি এর-দরুন সৃষ্টি বৃহৎ মাত্রার রাষ্ট্রহীনতা। পরবর্তিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আবহে আমরা রাষ্ট্রসীমার নতুন সমীকরণ তৈরি হতে দেখেছি। যুদ্ধের ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে অজস্র মানুষ তাঁদের ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়েছেন। সে নিয়ে স্বতন্ত্র আলোচনা হতে পারে, কিন্তু সেই সামাজিক পরিস্থিতির ব্যাখ্যায় গুরুত্বপূর্ণ আয়ারেনটাইন মতবাদ। ১৯৪৩-এ প্রকাশিত তাঁর 'দি রিফিউজিস' বইতে দেশবাসীর ক্রমচ্চ বিভাগ বা হায়ার্কিকে বিপরীত ক্রমান্বয়ে সাজিয়েছেন। ইউরোপে ইহুদিদের ওপর জার্মানির তৃতীয় রাইখের নির্যাতন এবং সর্বস্তরে উদবাস্তু— এই নিয়মটি ভাঙার কথা বলেন। তিনি এই বইয়ে লিখেছেন, দেশহারা মানুষ মুখ বুজে সব সয়ে যায় আর ইতিহাস নির্মাণের সাক্ষী হয়ে থাকে।

ঔপনিবেশিক শাসনের থেকে মুক্তির সোপানে পৌঁছে যাওয়া আমাদের এই স্বাধীন ভারতবর্ষই নয়, তথাকথিত উন্নত বিশ্বের ক্ষমতার লোভ ও আগ্রাসনের পরিণতিতে রাষ্ট্রসীমা ও ধর্মের আধিপত্যকামী আগ্রাসনের বলি হয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ স্বভূমিচ্যুত হয়েছেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ উদ্‌বাস্তু হয়ে এক ভয়ানক পাশবিক অবস্থায় দিনযাপন করছেন বা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করছেন গোটা বিশ্বেই। আজকের ডিজিটাল সভ্যতার যুগেও এই ইতিহাস আদিম হিংস্রতার থেকে কম নয়। মধ্যপ্রাচ্য এর নির্মম উদাহরণ। ইরান, ইরাক, সিরিয়া সহ মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে রাখার নব্য সাম্রাজ্যবাদীদের অবরোধী কৌশল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময় থেকে একের পর এক আভ্যন্তরীণ সংঘাত, সীমান্ত সংঘর্ষে বিপর্যস্ত এই অঞ্চলের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। অমানবিক এই লড়াই ক্রমাগত প্রাণঘাতী হয়ে উঠেছে, এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় মানুষ দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছেন, হচ্ছেন। দেশ হারানো আতঙ্কিত এই উদ্‌বাস্তু স্রোত আজ ইউরোপের দরজায় কড়া নাড়ছে। জীবন বাজি রেখে লক্ষ লক্ষ মানুষ ছোটো ছোটো জলযানে করে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিচ্ছেন প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে। ২০১৫-এর প্রথম আট মাসে ইউরোপের দেশগুলোতে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ মানুষ দেশ ত্যাগ করে প্রবেশ করেছে বলে দাবি করছে তারা। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ তাদের মানবিক আচরণের উদাহরণ তুলে ধরে বিশ্ব গণমাধ্যমের বেশির ভাগ অংশ জুড়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করছে।

সমুদ্র সৈকতে বালুর উপর মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা আইলান কুর্দি একটি উদাহরণ মাত্র নয়, একটি প্রতীক, উদ্‌বাস্তু বিপন্নতার। পশ্চিমি গণমাধ্যমে আরো একটি হৃদয় বিদারক ঘটনা তুলে ধরা হয়েছিল। বুদাপেস্ট থেকে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনার মাঝখানের একটি ব্যাস্ততম হাইওয়েতে একটি পরিত্যক্ত ট্রাক উদ্ধার করা হয়। সেই ট্রাকের মধ্যে গাদাগাদি করে পড়েছিল ৭১ জন সিরীয়'র মৃতদেহ। দেশ ত্যাগ করে তাঁরা অস্ট্রিয়ায় আসছিলেন বাঁচবার তাগিদে। ঠিক সেই দিনেই আর একটি খবর প্রকাশিত হয়, লিবিয়ার নৌবাহিনী ভূমধ্যসাগরের থেকে একটি জলযান উদ্ধার করেছে, যার মধ্যে ১০৫ জনের মৃতদেহ পড়ে ছিল। এই মানুষেরা নিজেদের জীবন হাতে নিয়ে উপচে পড়া নৌকায় ইউরোপের 'স্বপ্নভূম'-এর দিকে রওনা দিয়েছিলেন। শুধু নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে দেশ থেকে পালানো 'উদ্বাস্তু'ই নয়, তিন বছর আগের হিসাবেই দেখা যাচ্ছে যে সিরিয়ার সীমান্তবর্তী দেশগুলোতে যে সমস্ত উদবাস্তু শিবির করা হয়েছে তাতে ১ কোটি ১৬ লক্ষ মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন। সংখ্যাটা ইউরোপে আশ্রয় নেওয়া মানুষের থেকে অনেক অনেক বেশি।

রাষ্ট্রসংঘের উদ্‌বাস্তু সংক্রান্ত বিভাগ UNHCR তাদের প্রতিবেদনে জানাচ্ছে ২০০৫ সালে ৩৭.৫০ মিলিয়ান উদ্‌বাস্তু সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪ সালে ৫৯.৫০ মিলিয়ান হয়েছে। এই বিপুল সংখ্যক শিকড় হারানো মানুষের অধিকাংশই ইরাক, লিবিয়া, আফগানিস্থান, ইয়েমেন এবং সিরিয়া থেকে উৎপাটিত মানুষ। জীবন বাজি রেখে এই বিপুল সংখ্যক মানুষের ঢল বিশ্ব বিবেকের সামনে এক রূঢ় বাস্তবতা। আমরা দেখব যে পশ্চিমি মিডিয়া এই সংবাদ কেবল তথ্য আকারে পরিবেশন করছে, কিন্তু এই সংঘাতের কারণ ও তার নিরসনের ভাবনা কারো মধ্যে নেই। উদাসীন বিশ্ববিবেক সমস্যার শেকড়ে যাওয়ার প্রশ্নে আশ্চর্য নিস্পৃহ।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধত্তর সময়ের একটা পর্বকে 'এজ অব রিফিউজি' বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। ইউরোপ সহ বিশ্বের একটা বিরাট অংশ বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে আয়, ফলে নানা দেশ থেকে উদ্‌বাস্তু স্রোতের ঢল নামে। বিশ্বযুদ্ধের পর সেই সমস্যার কিছুটা সমাধান হয়। এরপর ইহুদিদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ইজরায়েল গঠনের প্রশ্ন আসে, নানা জায়গা দেখে ও বিচার করে সম্পূর্ণ জাতিসত্তার নিরিখে একটি দেশ স্থাপন করা হয়। এর ফলে জন্ম নেয় প্যালাস্টাইন সমস্যা, শরণার্থী হন অজস্র মানুষ।

এশিয়ার উত্তর ও দক্ষিণে কোরিয়ার বিভাজনের ফলে আবার উদ্‌বাস্তু সমস্যা দেখা দেয়। এই 'এজ অব রিফিউজি'র অধ্যায়কে পেছনে ফেলে দিয়েছে মধ্য প্রাচ্যের উদ্‌বাস্তু স্রোত। ৯/১১-র পর মার্কিন আগ্রাসনের চেহারাটা আরো নগ্ন হয়ে ওঠে। গত এক দশকে তাদের প্রত্যক্ষ ভূমিকায় আটটি যুদ্ধ সংঘটিত হয় ওই অঞ্চলে। প্রতিরোধী সাদ্দাম থেকে শুরু, এর পর থেকে একে সিরিয়া, লিবিয়া, সোমালিয়া, সুদান, ইরান, যুদ্ধের পাশাপাশি তীব্র অনাহার ও বিপর্যয় নেমে আসে এসব অঞ্চলের মানুষের জীবনে। দেশ ছেড়ে পালান লক্ষ লক্ষ মানুষ, অনেকেই অনাহারে মারা যান। হানাহানির যাবতীয় পরম্পরাকে ছাড়িয়ে যায় সিরিয়ার ঘটনা। সিরিয়ায় পশ্চিমি গণ মাধ্যমের তথ্যয় জানা যাচ্ছে যে মৃতের সংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ। যে সিরিয়া একসময় ওই অঞ্চলের সমৃদ্ধতম দেশ ছিল, চার বছর ধরে চলা যুদ্ধে তা আজ নিঃস্ব রিক্ত। আড়াই কোটি মানুষের দেশ সিরিয়ার ৭৬ লক্ষের বেশি মানুষ ভিটেমাটি থেকে উদ্‌বাস্তু হয়েছেন।

সিরিয়ার আগে মার্কিন দাদাগিরির ফলে গণহত্যার উদাহরণ ইরাক। ১৯৯৯ থেকে ২০০৩, চার বছর ইরাকে মার্কিনি হানাদারি চলে। এর পর আরো তেরো বছর অর্থনৈতিক প্রতিরোধ, মার্কিন সহযোগী হয় ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালি ও স্পেন। জ্বালানি তেলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মজুত ভাণ্ডার ইরাক। সাদ্দাম হুসেইন সেদেশের তেলের খনিগুলোর জাতীয়করণ করেন। ফলে সাদ্দাম অপসারণ জরুরি ছিল পশ্চিমি শাসকদের কাছে। পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্র ইরাক মজুত করেছে এই অভিযোগে মার্কিনি হানা হয় সেই দেশে, ২০০৩-এর ২০ মার্চ। এর আগে যদিও রাষ্ট্রসংঘ প্রতিনিধিরা সেখানে তদন্তে গেলেও তেমন কোনো প্রমাণ পায়নি। ৭ এপ্রিল ইরাক দখল ও সাদ্দামের ফাঁসি। ২০০৪ সালে সিআইএ জানায় ইরাকে গণ বিধ্বংসী অস্ত্র রাখার খবর ভুল ছিল। অথচ সেই আগ্রাসী যুদ্ধের তাণ্ডবের পর শুরু হয় সেদেশে ভয়ানক আভ্যন্তরীণ সংঘাত, ইতিহাসের স্বর্ণধ্যায়ের ঐতিহ্য বহনকারী ইরাকে জাতি দাঙ্গার ইতিহাস ছিল না, যুদ্ধের বিপন্নতা সেই দাঙ্গার আমদানি করল। ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হতে থাকল মানুষ, সভ্যতার আঁতুড়ঘরে মানুষ

উদ্‌বাস্তু হতে থাকল। যুদ্ধ-পরবর্তী সময়েই আভ্যন্তরীণ দাঙ্গার বলি দশ লক্ষ মানুষ, লক্ষ লক্ষ শিশু শিক্ষা অঙ্গনের বাইরে।

সোভিয়েত পতন পরবর্তী বিশ্বের বড়দাদা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে তার দখলদারি কায়েম রাখতে মরিয়া। এর ফলে প্রত্যক্ষভাবে সে যুদ্ধের মদত দিয়ে চলেছে নানা ভণিতায়। তালিবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে আফগানিস্থান, পাকিস্থান অঞ্চলে প্রাণ হারিয়েছেন অজস্র মানুষ। সোভিয়েত সেনা প্রত্যাহার পরবর্তীকালে আফগানিস্থানের মানুষের সামনে বিপদ আরো ভয়ানক হয়ে দেখা দেয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ ভিটেমাটি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয়ের খোঁজে ছুটছেন। একসময় মার্কিন মদতেই জন্ম নিয়েছিল আল-কায়দা। ১৯৯৬-তে উগ্র ধর্মীয় আধিপত্যবাদী তালিবানদের দখলে যায় রাজধানী কাবুল। এই তিন দশকে আফগানিস্থান ছিল শরণার্থী তালিকায় শীর্ষে। আটের দশকে ৩৫ লক্ষ উদ্‌বাস্তু ছিল পাকিস্তানে, ২০ লক্ষ ইরানে। এই শতাব্দীর শুরুতে মার্কিন ভূমিকায় ন্যাটো বাহিনী আফগানিস্থানে তাদের অপারেশন চালায়। আবার উদ্বাস্তুর স্রোত নামে। ১৫ লক্ষাধিক মানুষ দেশ ত্যাগ করে পাকিস্থানে আশ্রয় নেয়, ১০ লক্ষ ইরানে।

গত দশক থেকেই পশ্চিম দুনিয়া প্রত্যক্ষ ভাবে ক্ষমতায়নে নাক গলাল সিরিয়ার মতো লিবিয়াতেও। মার্কিনি শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে ন্যাটোর অন্যান্য শরিকেরা আক্রমণ হানল লিবিয়ায়। তছনছ হয়ে গেল সুন্দর দেশটা। ভূগর্ভস্থ তেল সম্পদের জন্য সমৃদ্ধ এই আফ্রিকান দেশের ২০ লক্ষ মানুষ দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হলেন। এই বিপুল সংখ্যক উদ্‌বাস্তু আশ্রয় নিল তিউনিশিয়া, সুদান সহ পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে। যে দেশের মানুষের গড় আয়ু আফ্রিকার সর্বোচ্চ ছিল সেই দেশ লিবিয়ার সাড়ে চার লক্ষ মানুষ আজ উদ্‌বাস্তু হয়ে আস্তানাহীন হল। ২০ লক্ষ মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন তিউনিশিয়ায়। এই মুহূর্তে সুদানে আশ্রয় নিয়েছেন সবচেয়ে বেশি মানুষ। রাষ্ট্রসংঘের হিসাবেই সেই সংখ্যা ২২ লক্ষ ৫০ হাজার।

গত ২৭ ডিসেম্বর ২০১৯-এ রাষ্ট্রসংঘের পক্ষ থেকে এক প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে লিবিয়া থেকে ইউরোপ ঢুকতে গিয়ে নৌকা ডুবে ২১৫ জন অভিবাসীর সলিল সমাধি হয়েছে। ২৪ ডিসেম্বর ভূমধ্যসাগরের ত্রিপোলির কাছ থেকে নৌকাটি ও ৯৫ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। উপকূলের অন্য অংশ থেকে ১৩০ জনকে নিয়ে রওনা হওয়া একটি জলযান উলটে মৃত ৭০ জনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। বাকিদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ত্রিপোলির নিকটবর্তী গারদুলি থেকে ৪০ জনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনার ফিলিপ্পো গ্রান্ডি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেছেন, 'এর মৃত্যুগুলো প্রমাণ করে যুদ্ধ ও দারিদ্র্যের কারণে মানুষ এখনও তাঁদের সবটুকু সঞ্চয়, সম্মানের বিনিময়ে ঝুঁকি পূর্ণ পথ বেছে নিচ্ছে, শেষ পর্যন্ত তাঁদের জীবন দিতে হচ্ছে। ফেব্রুয়ারিতে ৯০ জন, এপ্রিলে ১১ জনের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিলো। তাদের হিসাবে ৬২ লক্ষ জনসংখ্যার লিবিয়াতে ৭ থেকে ১০ লক্ষ অভিবাসী রয়েছেন। আফ্রিকার সবচেয়ে বেশি ভূগর্ভস্থ তেল রয়েছে লিবিয়াতেই, ভ্রাতৃঘাতী গৃহযুদ্ধে ও মার্কিনি অবরোধে আজ সেই লিবিয়া এক রিক্ত ভূমি মাত্র।

শুধু আফ্রিকা নয় মার্কিন ও ন্যাটোর যুদ্ধ উন্মাদনার আগ্রাসনের বলি সাবেক সোভিয়েত ইউক্রেন। ইউরোপের সবচেয়ে উর্বর দেশ ইউক্রেন, আয়তনে ২য় বৃহত্তম। ইউক্রেনের সংস্কৃতিও সমৃদ্ধ। সেই দেশের থেকে যুদ্ধ উন্মাদনার বলি হয়ে ২৬ লক্ষ মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন রাশিয়ায়।

আমরা দেখেছি মায়নামার সরকারের প্রত্যক্ষ ভূমিকায় জন্ম নেওয়া রোহিঙ্গা উদবাস্তু সমস্যা। সেনা বাহিনীর পেশিশক্তির সামনে অসহায় মানবিকতার পতন। যে সুচি'কে শান্তির দূত ভেবেছিল বিশ্ব সেই সুচি'র সেনা নির্মম হত্যালীলা চালাল সেখানে। লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা জীবন বাজি রেখে স্থল ও জলপথে আশ্রয় নিয়েছে পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশে। এই রোহিঙ্গা উদাস্তুদের আস্তানা ও রাষ্ট্র পরিচিতি আজ একটি বড়ো সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। ইউ এন এইচ সি দ্বারা চিহ্নিত রাষ্ট্রহীন এই রোহিঙ্গা জাতি মূলত দুটি গোষ্ঠীর সংঘাতে জর্জরিত। প্রথম গোষ্ঠী মায়নামারের হীনযান-বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষ, যারা সংখ্যাগুরু, অন্যটি উত্তর আরাকান বা রাইখানের সুন্নি মুসলমান সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠী। ২০১০ থেকে মায়নামার সরকার এদের দেশ থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয় এবং তাদের সেই দেশের মানুষ হিসাবে মানিতে রাজি হয় না। এখানেও ভারত ভাগের সময় র‍্যাডক্লিফ-এর বাস্তব অবস্থান সম্পর্কে অজ্ঞাত থেকে সীমানা চিহ্নিতকরণ ও ১৯৪৮-এ মায়নামারের রাষ্ট্র পরিচিতির পর জটিলতা ভিন্ন মাত্রা নেয়। রাইখান বা পূর্বতন আরাকান অঞ্চল ও সেখানকার সংখ্যালঘু মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র প্রদেশ গড়ার কথা থাকলেও তা বাস্তবায়িত না হওয়া। ব্রিটিশ শাসনকালে অনেক মানুষকে আরাকানে স্থানান্তরিত করা হয়, বিপরীত দিক থেকেও অনেক মানুষ এদিকে আসেন। এ এক ঐতিহাসিক স্থায়ী প্রব্রজনের ঘটনা। কিন্তু বর্তমানের মায়নামার সরকার সেই দেশের অধিবাসী রোহিঙ্গাদের সেদেশের মানুষ বলে স্বীকার করতে রাজি নয়। তাদের বাংলাদেশি, বাঙালি, অনুপ্রবেশকারী বলে চিহ্নিত করে। ১৯৯৮ সালে বার্মার প্রধানমন্ত্রী জেনারেল খিন ন্যুন্ট UNHCR স্থাপন করেন এবং বলেন যে এরা আদৌ কোনোদিন মায়নামারের বাসিন্দা ছিল না। এরা অন্যায় ভাবে এদেশে এসেছে। অবৈধ অনুপ্রবেশকারী এদের জন্যই সেদেশের সমস্যা বেড়েছে। ১৯৮২ সালে মায়নামার সরকার এদের নাম

ভোটার তালিকা থেকে সম্পূর্ণ ছেঁটে দেয়। বিবাহ বা সহবাসের উপরেও নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এরপর এই দুই জাতি বা জনগোষ্ঠীর সংঘাতেই উদ্‌বাস্তু সমস্যা প্রবল আকার নেয়। যার প্রভাব শুধুমাত্র মায়নামার ও বাংলাদেশ বা ভারতের সীমান্তে সীমায়িত থাকে না, এর বিস্তার ঘটে এই অঞ্চলের অন্যত্রও। ভারত সরকার এই পরিস্থিতিতে এদেশের পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে বাংলাদেশি, রোহিঙ্গা প্রভৃতিদের প্রবেশ ও মিশ্রণ রোধ করতে জাতীয় নাগরিক পঞ্জি বা ন্যাশনাল রেজিস্টার অব সিটিজেন।

'এ কোন দেশ? রক্তেভেজা সড়ক, খোলা ক্ষত, নিদ্রাহীন রাত' (জয়া ঘটক)

সাম্প্রতিক বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো মানবিক ও সামাজিক সমস্যা শরণার্থী সমস্যা মূলত রাষ্ট্র কর্তৃক আগ্রাসী ভূমিকার ফল। লক্ষ লক্ষ মানুষ নিজ ভূমিচ্যুত হয়ে, শেকড়চ্যুত হয়ে এক অনিশ্চিত আগামীর সামনে, দিশাহীন। সম্প্রতি নন্দিনী ভট্টাচার্য তাঁর একটি লেখার শুরুতে হানা আয়ারেন্টের 'উই রিফিউজি' থেকে উদ্ধৃত করেছেন, 'আমার ঘর হারিয়েছি, সেই ঘর যা প্রতিদিনের বেঁচে থাকার পরিচয়, হারিয়েছি জীবিকা, যার মাধ্যমে এই জোরটা পাওয়া যায় যে, এই পৃথিবীতে আমারও কিছু অবদান আছে, আমাদের মুখের ভাষাও হারিয়ে গেছে, যে ভাষায় ফুটে ওঠে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া, প্রকাশ পায় আচারে-ব্যবহারের সহজ-সরল রূপ আর অনুভূতির আসল রঙ।...সমসাময়িক কালে এক নতুন শ্রেণির মানুষের সৃষ্টি হয়েছে, যারা শত্রুপক্ষের দ্বারা নিক্ষেপিত হয় কনসেন্ট্রেশান ক্যাম্পে আর মিত্রপক্ষের দাক্ষিণ্যে যাদের ঠাই হয় বন্দিশিবিরে।' এই নতুন শ্রেণির মানুষেরা যদিও কেবল আজকের নয়, এক আবহমান কালের সৃষ্টি, রাষ্ট্রের ধারণার উষাকাল থেকেই। মানব সভ্যতাকে এই রাষ্ট্রের উপহার রাষ্ট্রহীন না-মানুষেরা যুগেযুগে তাদের মাটি খুঁজে চলেছেন। আয়ারেন্টকে উদ্ধৃত করেই বলা যায় যে জাতিরাষ্ট্র হল এমনই এক পুরোনো বস্তাপচা ব্যবস্থা যার ফলস্বরূপ জন্ম নেয় রাষ্ট্রহীনতা।

সাম্প্রতিক ভারত

সবশেষে যে জিজ্ঞাসাটা আমাদের সামনে উঠে আসছে তা হল, আবার কি আমরা, ভারতবর্ষের এই পূর্বাঞ্চলের মানুষ শেকড় চ্যুত হব? আবার কি বিপন্ন হবে আমাদের সংহতি চেতনা? ধর্মীয় পক্ষপাতদুষ্ট শাসকের হাতে সাধারণ নাগরিকের অধিকার ও জীবন কখনো নিরাপদ থাকে না। আমাদের দেশেও আজ মানুষের সামনে সেই বিপন্নতা এসেছে। দেশের উত্তর পূর্বের জনবৈচিত্র্য ও ভিন্নতা সবচেয়ে বেশি, স্বাভাবিক ভাবেই বিরোধের আগুন ছড়ানোর সুযোগও বেশি। এই বৈচিত্র্যকেই পাখির চোখ করে ইতিপূর্বে ব্রহ্মপুত্র অঞ্চলে একের পর এক জাতি দাঙ্গা সংঘটিত করানো হয়েছে। সম্প্রতি এই বিরোধের আগুনকে উশকে দিয়েছে জাতীয় নাগরিক পঞ্জি। ২০১৪ সালে সুপ্রিম কোর্ট বিদেশিদের চিহ্নিত করার জন্য নাগরিক পঞ্জি নবীকরণের আদেশ দেয়। আসাম চুক্তিতে লেখা ছিল ১৯৭১-এর ২৪ মার্চের পর যাঁরা এদেশে এসেছেন তাঁরা বিদেশি বলে গণ্য হবেন। এর আগে ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত আসাম আন্দোলনে ওই অঞ্চলের জীবন জীবিকা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। আসাম চুক্তি উত্তর পূর্বাঞ্চলের ইতিহাসকে পর্ব বিভাজন করে ফেলে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সংগ্রামী অসাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য ফিকে হয়ে গিয়ে সেখানে ভাষা গোষ্ঠী ও জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বের প্রশনকে মুখ্য করে তোলা হয়। ভৌগলিক অবস্থানের কারণে আসাম সহ উত্তর পূর্বে প্রব্রজনের ঘটনা ঐতিহাসিক কাল থেকেই ঘটে চলেছে। হিমালয়ের সীমান্ত অতিক্রম করে আসা মঙ্গলয়েড, বোড়ো জনগোষ্ঠীর বিস্তার, সন্নিহিত অঞ্চলের বাংলা ভাষাভাষী, দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে আসা অহম জনজাতীর মিলনক্ষেত্র এই ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও পরবর্তীতে মার্কিন কূটকৌশলে এখানে প্রব্রজন ও ভূমিপুত্রের সংঘাতকে লালন করা হয়েছে। এখানে সেই ইতিহাস চর্চার অবকাশ নেই, শুধু সাম্প্রতিক চেহারাটা তুলে ধরলে দেখা যাবে লক্ষ লক্ষ মানুষকে আবার শেকড়হীন করে উদ্‌বাস্তু করার কাজ চলছে এবং তা রাষ্ট্রীয় মদতে। ১৯৭৯ সালে আসাম আন্দোলনের আরম্ভের পর থেকেই বিদেশি বিতাড়নের দাবি তোলা হয়। ১৯৮৩-তে ইন্দিরা গান্ধী আসাম আন্দোলনকারীদের আন্দোলনকে নস্যাৎ করে পার্লামেন্ট ও রাজ্য বিধানসভায় একসঙ্গে নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেন। এতে আন্দোলনকারীরা মরিয়া হয়ে ওঠে, 'বিদেশি' ছুতোয় আসলে আক্রমণের অভিমুখ ঘুরিয়ে দেওয়া হয় বাঙালিদের বিরুদ্ধে। ফেব্রুয়ারির ১৮ তারিখে এই হিংসা আছড়ে পরে নেলী'তে। এক রাতে ২০০০-র উপর বাংলাভাষীকে হত্যা করা হয়, দুধের শিশুরাও নিস্তার পায়নি। এদের অধিকাংশ ছিল বাংলাভাষী খেতমজুর ও কৃষক। এই সময়ই একে একে সিলাপাথার, মংগলদৈ, ডিগবয় সহ বিভিন্ন জায়গায় হত্যা ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। অভিযোগ যে এই সময় আরএসএস-এর প্রভাব এই আন্দোলনের পেছনে সক্রিয় ছিল।

১৫ আগস্ট আসাম চুক্তি হয়, ঠিক হয় ২৪ মার্চ ১৯৭১-এর পরে আসা মানুষদের বিদেশি বলে চিহ্নিত করা হবে এবং বহিষ্কার করা হবে। আরো একটি ঘটনা এই আন্দোলনের বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় ঘটে, অসমীয় জাতীয়তাবাদ দুর্বল হতে থাকে, ক্ষমতা বাড়তে থাকে ধর্মীয় রাজনীতির শক্তির।

পাশাপাশি কার্বি, বোড় ও অন্য জনজাতিগুলোর স্বাধীকার আন্দোলন প্রসারিত হতে থাকে।

এখানে কিছুটা ইতিহাসের দিকে ফিরে দেখা দরকার। ইতিহাস জানে উত্তরপূর্বাঞ্চলের জনজাতি, ভাষিক গোষ্ঠী, সংস্কৃতির বিপুল বৈচিত্র্য এই অঞ্চলকে বরাবর স্পর্শকাতর রেখেছে। একাধিক সীমান্ত রেখা এই অঞ্চলকে রাজনৈতিক পাশা খেলার ছকে পরিণত করেছে। এই অঞ্চলে তৈরি হয়েছে বহিবলয়। পুঁজির অসম বিকাশের ফলে উত্তরপূর্ব ভারতের জনজাতি চিরায়ত সহাবস্থান ও নিস্তরঙ্গ জীবন দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দেখা দিয়েছে সন্দেহ, অসহিষ্ণুতা, অসূয়া ও যুক্তিহীনতার উদ্‌গিরণ। জাতিবৈরী বিষ বাধাহীনভাবে জনসমাজকে আচ্ছন্ন করেছে। এই অঞ্চলের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন জনসমাজকেও আমরা দেখি সত্যের থেকে দূরে চলে যেতে। তাদের অনুভব থেকে দূরে চলে যায় এই সত্যিটা যে, উত্তরপূর্বাঞ্চলের জাতিবৈরী ও আভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদের স্বার্থের অনুকূল অর্থাৎ রাষ্ট্রের দূর নিয়ামকদের স্বার্থের সহায়ক। এই মূক বিবেক এই প্রচারের মিথ্যায় প্রতিষ্ঠা দেয় 'মুসলিম আসাম'-এর জুজুকে। এই জুজুর আড়ালে পা রাখে মৌলবাদী শক্তি। এই শক্তি ক্ষমতার ভরকেন্দ্র হয়ে ওঠে। বিপন্ন হয় আদিবাসী সমাজের কৌম জীবনবোধ, ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মূল্যচেতনা। এই আবহে নষ্ট হয় জাতিসত্তা ও কৌম সত্তার চিরায়ত অভিজ্ঞান। ফলত অস্তিত্ব সংকটের আতঙ্কে একে অন্যের উপর হামলে পড়ে। হানাহানির ও বৈরী আবহে মানুষ ঘরছাড়া হয়। এই আক্রমণের সূচিমুখ প্রধানত ঘুরিয়ে দেওয়া হয় আসামবাসী বাংলা ভাষাভাষীদের দিকে। স্বাধীনদেশে জন্ম নেয় এক উদ্‌বাস্তু স্রোত, কিন্তু কোনদিকে যাবে এই নতুন করে ঘরছাড়া মানুষেরা? নির্বিকার ও প্রতিহিংসা পরায়ণ রাষ্ট্র উলটে তৈরি করে নতুন কনসেন্ট্রেশান ক্যাম্প।

আসাম সহ উত্তরপূর্বাঞ্চলে ঘনায়মান এই অধিকারে আমরা ভুলে যাই এই সমস্ত জনগোষ্ঠীর মিথষ্ক্রিয়ার পরম্পরা। শিক্ষার পশ্চাদপদতা সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্য বিস্মৃতি এনে দেয় সহজে। স্মৃতি-চ্যুত মানুষ সহজেই অন্তরবৃত ও বহিরাশ্রয়ী সংযোগ-প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সহজেই। সর্বোতভাবে বিদ্ধস্ত এই বন্ধনের বুনন একে অন্যের প্রতি আক্রমণমুখর শত্রুতে পরিণত করে। অথচ ইতিহাসের অধ্যয়নে দেখা যাবে বাঙালিরা এখানে স্বইচ্ছায় বা আধিপত্য কায়েমের অভিপ্সা নিয়ে আসেনি, এসেছে দৈবদুর্বিপাকে। ৪৭-এর আগে যারা আসে তারা এসেছিলেন জীবিকার তাড়নায়। পরবর্তিতে দেশভাগজনিত কারণে এসেছে ভাগ্যবিড়ম্বিত হয়ে। দুর্গত না হলে কেউ স্বেচ্ছায় ভিটে-মাটি ছেড়ে যায় না। আসামে আসা বাঙালিদের প্রধান কাজ ছিল টিকে থাকা, প্রভুত্ব নয়। কিন্তু বাস্তবে এই বিপুল সংখ্যক ছিন্নমূল বাংলাভাষী মানুষ অসমীয়াদের মধ্যে অস্তিত্বের সংকট নিয়ে আসে। তাকে আক্রমণমুখী হয়ে ওঠে। এই সময় থেকেই আবার অনেকেই নিরাপত্তার অভাব বোধ করে চলে আসতে থাকেন পশ্চিমবঙ্গে। আসামে বাঙালি বিরোধিতার সূত্রেই একের পর এক ভাষা আন্দোলন, বিদেশি খেদাও বা বিতাড়ন প্রভৃতি ঘটতে থাকে। মধ্যবিত্তের প্রভুত্বকারী জাতীয়তাবাদী মানষিকতাও নিজেদের ক্ষুদ্র গোষ্ঠী স্বার্থের বাইরে আনতে পারেনি। একসময় অসমীয়া বাঙালি সম্প্রীতির ডাক দিয়ে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মীরা যেভাবে পথে নেমেছিলেন জাটি দাঙ্গার প্রতিরোধে, পরবর্তীতে তা আর দেখা যায়নি। হেমাঙ্গ বিশ্বাস ভূপেন হাজারিকাদের শূন্যস্থান পূর্ণ হয়নি। এতে রাজ্যের বিকাশ থেমে যায়। উপরন্তু এতদিন যারা অসমীয়া জাতির অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল সেই বোড়ো, কার্বি, মিসিং, তিওয়া, ডিমসা, দেউরি প্রভৃতি— আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মস্বাতন্ত্র্যের দাবিতে পথে নামে। পারস্পরিক হানাহানি আবার আভ্যন্তরীণ ঘরছাড়া মানুষের সৃষ্টি করে। এই যুযুধান পরিবেশের মধ্যে জাতীয় নাগরিক পঞ্জিকরণ ও নাগরিকত্ব সংশোধন আইন আগুনে ঘি দেয়। এর পরিণতি কী হবে তা সময়ই বলবে, তবে গোটা দেশের প্রতিবাদ আর আসামের প্রতিবাদের ধরন ও লক্ষ ভিন্ন এটা মাথায় রাখা দরকার।

আসাম থেকে যে নতুন ভাবে উদ্‌বাস্তুর জীবনে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে নাগরিকদের তা নিয়ে রাজনৈতিক পক্ষগুলোর নানা স্ববিরোধী ভাষ্য রয়েছে। কিন্তু বাস্তবিকই কত জন বহিরাগত তা নিয়ে সঠিক কোনো তথ্য কারো কাছেই নেই। জাতীয় নাগরিক পঞ্জির নামে এক জটিল ও অবাস্তব গণনার সামনে নাগরিকদের মুখোমুখি করানো হয়। প্রথমে ৪০ লক্ষ মানুষকে তালিকার বাইরে রাখা হয়, দুই দফা তালিকা ঘোষণার পর দেখা যাচ্ছে ১৯ লক্ষ মানুষের জন্য কোনো দেশ নেই, রাষ্ট্রহীন নাগরিক তারা। এদের একটা বড়ো অংশ হিন্দু ধর্মীয়। এদের ঠিকানা হল নব্য কনসেন্ট্রেশান ক্যাম্প 'ডিটেনশান ক্যাম্প'। এই 'বিদেশি'দের মধ্যে রয়েছেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির সন্তান-সন্ততি, কারগিল যুদ্ধের সেনা, বংশপরম্পরায় এদেশে থাকা অধ্যাপক, চাকুরিজীবী থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্যও। কয়েকটি উদাহরণ নিলে বাস্তব চিত্রটা পরিষ্কার হবে। জিয়াউদ্দিন আলি আহমেদ ও তার স্ত্রী বিদেশি বলে চিহ্নিত হয়েছে, অথচ বংশ পরম্পরায় তারা এদেশে আছে, ৫ম রাষ্ট্রপতির বংশধর। গৌতম পাল, পঞ্চাশ বছর বয়স, জন্ম আসামে, সবজি বিক্রেতা, তার ভাই বোনের নাম এনআরসি-তে নাম নেই। কনিষ্ক লস্কর, ৬৫, বিহারে জন্ম, আসামে শিক্ষকতার কারণে আসেন, এখানেই অবসর নেন, উনি ও তার দুই সন্তান তালিকায় জায়গা পাননি। সাফিউদ্দিন আহমেদ, ৩৬,

আসামে জন্ম, স্কুল শিক্ষক, সপরিবারে তালিকার বাইরে। এইরকম অজস্র মানুষের জন্য ডিটেনশান ক্যাম্প প্রতীক্ষা করছে। ইতিমধ্যে ৪৭ জন এই ক্যাম্পের অমানবিক পরিবেশে মৃত্যুকে গ্রহণ করেছেন, মৃত্যুর পর প্রাপ্ত ও প্রমাণিত নথিতে প্রশাসন মানছে তাঁরা ভারতীয় ছিলেন।

এনআরসি থেকে সিএএ, বিদেশি চিহ্নিতকরণের নামে এও এক ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি। যে রাজনীতির বলি হয়েছেন সাধারণ মানুষ। আবার লক্ষ লক্ষ মানুষকে ভূমিচ্যুত করার হৃদয়হীন রাজনীতির পাশাখেলা। বিশ্বের ইতিহাসের রক্তাক্ত অধ্যায়ে জুড়েছে বাংলা চ্যাপ্টার, সৌজন্যে ধর্মীয় ফ্যাসিস্ট শক্তি। অশান্ত আসামের মাটিতে দাঁড়িয়ে একদিন সম্প্রীতির ভাঙা সুতো জুড়তে গান ধরেছিলেন আসাম-গর্ব ভূপেন হাজারিকা,

'সংখ্যালঘু কোনো সম্প্রদায়ের/ভয়ার্ত মানুষের না-ফোটা আর্তনাদ/যখন গুমরে কাঁদে/আমি যেন তার নিরাপত্তা হই'।

আজ সেই মন্ত্র উচ্চারণে অযুত কণ্ঠ গেয়ে উঠুক।

আমার কলকাতা

অশোককুমার মুখোপাধ্যায়

ভোররাত থাকতেই খোল-করতাল বাজিয়ে হরিনাম করতে-করতে, ছাদখোলা ঘোড়ার গাড়ি চেপে গঙ্গা নাইতে যেতেন মিশ্রজি। হরেকৃষ্ণ নামের সঙ্গে মিশে যেত ঘোড়ার কপকপ-খপখপ। সারারাত ঠেলায় আলু-পেঁয়াজ-বেগুন-পটল-মুলো চলবার হাঁপানি-হেঁইওতে যে ঘুমের আঠা পাতলা হয়নি, ওই করতালের হইচইতে তা হালকা। আবার যেই একটু চোখের পাতা লাগতে শুরু করেছে, নিখুঁত ভৈরবীতে বেজে উঠত জাহাজের ভোঁ। ভোরের স্বপ্নের নেপথ্য সংগীত! তবে, থিয়েটারের থার্ড বেল বাজাত রাস্তা ধোওয়ার হিসহিস। ঘুমভাঙা রাস্তায় হাইড্রেন্টের গঙ্গার জল পড়তেই নীচের জানালার খড়খড়িকে ফাঁকি দিয়ে ঢুকে পড়ত জলের ভাপ। তখনই বোঝা যেত গঙ্গার জলের গন্ধ আলাদা। শুধু গন্ধ নয়, উৎসাহী জলের ছিটেও ঢুকে পড়ত কখনো। করপোরেশনের লোকটিকে খুব একচোট বকে দিতে যেই জানালা খোলা, এক পাল শিশু-রোদ কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বেই। কোল থেকে হড়কে ঘরের মেঝেতে নেমে হামাগুড়ি দেবে! দক্ষিণে লেডি ডাফরিন হাসপাতালের উপরের কার্নিশে টলমল করছে নরমচামড়ার রোদ্দুর। বকা ভুলে ওইদিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। কার্নিশের প্রান্তে সারিবদ্ধ কাক বাহিনী— ছত্রী বাহিনী ভূতলে অবতরণের আগে জরুরি শরাপরামর্শ সেরে নিচ্ছে। আকাশছোঁয়া চিলের দল এঁকে চলেছে নিজস্ব নিয়মের বৃত্ত।

এইভাবেই আমাদের স্কট লেন পাড়ায়, যাকে চাঁপাতলা বলা যায় আবার মুচিপাড়াও, সকাল হত। সকাল মানেই স্কুলে যাবার তাড়া। দুধ-পাঁউরুটি খেয়ে, টিফিন বাক্স পিঠের ব্যাগে ভরে স্কুলের উদ্দেশে হাঁটা শুরু। ছটা পঁয়তাল্লিশের মধ্যে পৌঁছতে হবে। পিঠের ব্যাগটি কাপড়ের। আগের রাতেই তাতে রুটিন দেখে খাতা-বই গুছিয়ে রাখা। সঙ্গে বাবা। অতএব, পা-চালিয়ে যাওয়া। অতএব তা ১৯৬১। এবং ১৯৬২-ও। হেয়ার স্কুল। স্কুল তখন দুতলা। পরে যারা স্কুলে ঢুকেছে তাদের এ-কথা বললে বিশ্বাসই করত না! পঞ্চম অবধি সকালবেলার ক্লাস। ষষ্ঠ থেকে একাদশ দশটায়। সাড়ে দশও হতে পারে। ১৯৬৩-তে, যখন তৃতীয় শ্রেণি, বড়ো হয়ে যাই। স্কুল ছুটির পর আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েই বাবা অফিস দৌড়োতেন। সেদিন অন্য কোনো চিন্তায় সোজা অফিস। এদিকে স্কুল ছুটির পর দেখি কেউ নেই। পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ কেউ নেই। হয়তো আসতে দেরি হচ্ছে। ঠিক আছে। ঘণ্টা পিটিয়ে ক্লাসের সূচনা-সমাপ্তি ঘোষণা করে যে রামধনি, মূল ফটকের লাগোয়া যার এক চিলতে ঘর, তার সামনেই বসে রইলাম। একে-একে চলে গেল সকালের সবাই। ডে-সেকশন শুরু হয়ে গেল। রামধনির দেওয়া কাঠের টুলের ওপর বসে আছি তখনও।

'কী রে তোকে কেউ নিতে আসেনি?' ডে-সেকশনের হেড মাস্টার মশাই গৌরগোপাল রায়। রামধনি ধরে এনেছে! দেখলেই ভয় করে। তবে মোহনবাগান সাপোর্টার। ক্লাবের কথা শুনলেই, নরম। তা জেনে, মোহনবাগান জুনিয়র সেকশনে খেলত এমন কত যে খেলোয়াড় হেয়ার স্কুলে ঢুকে পড়েছিল তখন! আমরা অবশ্য ওই নীল জার্সি পরা ছেলেদের দেখে খুবই হইচই করতাম। প্রিয় ক্লাবের ছেলে বলে কথা! ওদের পরেই আমাদের আর এক গর্বের ছেলেরা যুগের যাত্রী-র। সাদা জার্সি। নীল-সাদায় ভালোই ভাব। তবে যুগের যাত্রী মহড়া দিত আমহার্স্ট স্ট্রিট লাহাবাড়ির উলটো দিকের হৃষীকেশ পার্কে।

'কেউ আসেনি?...'

দুদিকে মাথা নাড়ালাম। এবং সত্যের খাতিরে এইটাও বলা দরকার— চোখ দিয়ে টুপটাপ, টুপটাপ...।

'দাঁড়া... দাঁড়া... ভয় পাসনে... দেখছি' বলতে বলতে স্যার চলে গেলেন স্কুলের ভেতরে। একটু পরেই ফিরে এলেন গণেশকে নিয়ে। ওঁর খাস পিয়ন। রংচটা ধুতি, আকাশি শার্ট।

'রাস্তা চিনে যেতে পারবি তো?'

মাথা নাড়ালাম, 'হ্যাঁ স্যার...এই তো রাস্তা পেরিয়ে গোলদিঘি, মির্জাপুর স্ট্রিট, আমহার্স্ট স্ট্রিট, স্কট লেন... আট—'

রাস্তা মুখস্থ দেখে হেডস্যার খুশি, 'আচ্ছা যা—'

গণেশের কাছে নিশ্চয়ই বাড়ির ঠিকানা দেওয়া হয়েছিল। কারণ, কুড়ি ফুট এগোয় আর বুকপকেট থেকে কাগজ বের

করে রাস্তা মেলায়। এমন ব্রেক জার্নি করতে করতে যতক্ষণে বাড়ি পৌঁছলাম, দেরি দেখে মা বেরিয়ে স্কুলে গেছেন আমাকে খুঁজতে। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এলেন। গম্ভীর। হেড মাস্টার মশাই প্রচুর উত্তম-মধ্যম বাক্য নিক্ষেপ করেছেন। সন্ধেবেলায় বাবা ফিরতেই মা'র হইহই। সব শুনে বাবা আমার দিকে। গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, 'বাহ তুই তো বড়ো হয়ে গেছিস... কাল থেকে একাই যাওয়া-আসা করবি।' বাবার রায় বরাবরই এমন আশ্চর্যের, সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্ট (কলেজে ভরতি হবার সময় প্রিন্সিপাল মশাই কিছু ট্যারাব্যাঁকা বলেছিলেন। তাঁর প্রথম শ্রেণিতে পাশ করা ছেলেকে হেনস্থা হতে দেখে, বাবা প্রিন্সিপালকে একবার দেখে নিয়ে কড়া গলায় ছেলেকে বললেন, এমন কলেজে পড়বার দরকার নেই, যা আলুর চাষ কর। ধুতি-পাঞ্জাবি ভদ্রলোকের নাজেহাল অবস্থা)। এর ওপরে আপিল চলে না। সেই থেকে আমি বড়ো হয়ে গেলাম। দায়িত্ব বাড়ল। ছোটোভাই প্রথম শ্রেণিতে ভরতি হলে, তাকে সঙ্গে নিয়ে গুটিগুটি রাস্তা পেরিয়ে স্কুলের দিকে। আমহার্স্ট স্ট্রিট পার হতে তেমন কিছু অসুবিধে হত না। একটাই তো বাস চলে— থ্রি বি। আর কখনো ময়লা নেবার লরি। বোধহয় বেডফোর্ড কোম্পানির। কলেজ স্ট্রিট পেরোতে দুদিক ভালো করে দেখে নিতে হত। বাস এবং ট্রাম। ট্যাক্সি নজরে পড়ত না ওই সকালে।

হেয়ার স্কুলের ক্লাসে বসেই গোলদিঘি দেখা যেত তখন। সেনেট হল ভাঙার গুমগুম শব্দই বা ভুলি কী করে! চোখের সামনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন বাড়ি তৈরি হল। উঁচু ক্লাসে ওঠবার পর ডে-সেকশনের ইংরেজি শিক্ষক হিমাংশুবাবুকে বলতে শুনেছি, 'কী বায়োস্কোপ হলের মতো বাড়ি বানিয়েছে!'

এক সকালে বিছানায় শুয়েই গানের আওয়াজ ভেসে এল— 'ওরে নূতন যুগের ভোরে...।' জানালা খুলতেই দেখি বিনয়কাকু, আশুকাকু, পঙ্কজদি সবাই। সারি দিয়ে চলেছে। আমরা স্কুলে সকালবেলায় ক্লাস শুরু হবার সময় এমনই সারি দিয়ে গাই 'আনন্দলোকে, মঙ্গলালোকে, বিরাজ সত্যসুন্দর...' কিন্তু বিনয়কাকু-আশুকাকু এরা তো স্কুলে পড়ে না, চাকরি করে। তবে?

'বাবা, এরা গান করছে কেন?'

'জানো না, আজ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একশো বছর হল, তাই প্রভাতফেরি বেরিয়েছে, উইলিয়ামস লেন হয়ে স্কট লেন—'

উইলিয়ামস লেন উত্তরে গিয়ে স্কট লেনে মিশেছে। একটি চার্চ ছিল সেখানে। এখনও আছে নিশ্চয়। হয়তো বন্ধ, তবু থাকার তো কথা। প্রতি রবিবার চার্চে প্রার্থনা। গোরা সাহেব-মেম অ্যাংলো ইনিয়ানদের ভিড় জমে যায়। চার্চটির শুরু ১৮৬৩। আমি ইতিহাসে অত কিছু ভালো নই। সাল-তারিখ গুলিয়ে যায় কখনো। তবে ওই চার্চটি যে ১৮৬৩-র সন্দেহ নেই। এত নিশ্চিত হবার কারণ আছে।

এক সকালে বাবার হাত ধরে হাঁটছিলাম উইলিয়ামস লেন ধরে। দেখি চার্চ চত্বরে বিশাল একটা এরোপ্লেনের মতো কিছু দাঁড় করানো। তার গায়ে লেখা, ১৮৬৩-১৯৬৩।

'এই এরোপ্লেনটা এমন কেন?'

'ওটা প্লেন নয় রে... স্পুটনিকের মডেল...'

বাবা ভালো করে বোঝালেন— চার্চটার বয়স একশো হল সেইজন্য উৎসব হবে। এই অনুষ্ঠানের জন্যই স্পুটনিক।

'স্পুটনিক জানিস তো?' বাবা হাসলেন।

'হ্যাঁ' বলে মাথা নাড়ালাম। ক্লাস থ্রি-র ছেলে স্পুটনিক জানবে না! ইউরি গাগারিন আর তার মহাকাশযান ভস্তক-এর নাম শোনেনি হয় নাকি! মুখে নিশ্চয় লায়েক-লায়েক ভাব ফুটে উঠেছিল।

কিন্তু বিস্ময়ের ঘোর কাটছিল না। 'এ-ক-শো বছর'!

'হ্যাঁ একশো...রবীন্দ্রনাথের জন্মের মাত্র দুবছর পরেই এই চার্চ...'

'বাবা তুমি কবে জন্মেছ?'

'উনিশশো সতেরো...'

'তার মানে তোমার এখন ছেচল্লিশ বছর?'

'বাহ, ভালো বিয়োগ শিখেছিস...'

আমার ঘোর-লাগা কাটতেই চায় ন। ১৮৬৩ যদি ক্রমশ ১৯৬৩ হয়ে যায়, তা হলে ১৯৬৩ নিশ্চয় একদিন ২০০০ সাল হবে।

বাবা বলল, 'হ্যাঁ হবে...'

আমি আরো অবাক— 'আমি দু'হাজার সাল দেখতে পাব? '

'হ্যাঁ নিশ্চয় পাবি, বল তো ক'বছর পরে দুহাজার হবে?'

মানসাঙ্কতে খুব খারাপ নয়। তবু সাবধানের মার নেই। দুহাজার থেকে উনিশশো তেষট্টি বাদ দিলাম। বিয়োগফলটা আবার উনিশশো তেষট্টির সঙ্গে যোগ করেও দেখে নিলাম দুহাজার হচ্ছে কি না।

'সাঁইত্রিশ বছর পরে...'

'বাহ, তুই তো যোগেও ভালো রে! দ্যাখ, তা হলে আর মাত্র সাঁইত্রিশ বছর পরেই দুহাজার সাল...'

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'আমরা দুহাজার সাল দেখতে পাব?'

'হ্যাঁ তুই মানে তোরা দু'ভাই পাবি, আমি পাব না।'

বাবার কথা ফলেছে।

দুই

স্কুলের একতলার ঘর থেকে গোলদিঘির লোহার বেড়া দেখা বন্ধ হয়ে গেল সেই বাষট্টি-তেষট্টি সালে, ভারত-চিন যুদ্ধের বছরে। স্কুলের চারদিকে মোটা-মোটা ব্যাফল ওয়াল। পাড়ায় অন্ধকার। ঘরের আলোয় কাগজের ঠুলি। স্কুল বন্ধ। চতুর্দিকে থমথমে ভাব। কিন্তু, সত্যি বলতে কী, আমাদের মজা। স্কুল বন্ধ, পড়া নেই। খাওয়া-দাওয়া আর খেলা। তার ওপরে যুদ্ধের কবলে পড়বার আশঙ্কায় শিলং থেকে জেঠু চলে এসেছে। পিসিরাও আসে ঘনঘন। রোজই হইচই। ঠান্ডার মধ্যে কম্বল চাপা দিয়ে জেঠুর সঙ্গে গুলতানি চলে। ২০ অক্টোবর ১৯৬২ থেকে যুদ্ধের একমাসে একটি ঘটনা এখনও বলবার মতো— বাড়িতে আমাদের জন্য 'শুকতারা' কেনা হত। ওতে হঠাৎই একদিন চিন-বিরোধী গল্প বের হল। বাবা বিরক্ত। এইভাবে ছোটোদের মন বিষিয়ে দেওয়া? শুকতারা বন্ধ হয়ে গেল। বদলে এল 'সন্দেশ'। সত্যজিৎ রায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পাদক। আমাকে সন্দেশের গ্রাহক করে দেওয়া হল। সত্যজিৎ রায়ের সই করা গ্রাহক কার্ড পেয়ে কী আনন্দ! কিন্তু উনি কে সে-সব তখন জানি না। এইটুকু জানি সুকুমার রায়ের ছেলে। আর যে 'আম আঁটির ভেঁপু' পড়তে খুব ভালো লাগে তার মলাট ওঁর আঁকা। কেউ একজন আমার নামে সই করে কার্ড পাঠিয়েছে তাতেই আমি খুশি। সেই নম্বর এখনও মনে আছে— দুই ছয় এক নয়। এর কিছু বছর পরে, জলবসন্ত হয়েছিল যখন, আমাকে মশারির ঘেরাটোপে থাকতে হত। যাতে একঘেয়ে না লাগে, বাবা আমার হাতে একটা খাতা দিয়ে বললেন, যা ইচ্ছে হয় লিখতে থাক। লিখেছিলাম একটা গল্প। পাঠিয়ে দেওয়া হল সন্দেশে— 'হাত পাকাবার আসর' পাতার জন্য। কী করে জানি না, ছাপাও হয়ে গেল! তখনই বুঝেছিলাম, আসলে বাবা-ই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, যে-কোনো অসুখের একটা ভালো দিক আছে।

যে পাড়ায় থাকতাম সেই স্কট লেনের বাড়ির গায়েই লেডি ডাফরিন হাসপাতাল। অধিকাংশ প্রসূতিরাই ভরতি হতেন ওইখানে। ঘুম না এলে নিশুতি রাতে শোনা যেত কোনো সদ্যোজাতের কান্নার আওয়াজ। কখনো শোনা যেত প্রসূতির আর্তনাদ। সে আওয়াজের মর্ম বোঝার মতো বয়স হয়নি বলেই বুঝিনি সে দিন।

তখন আমাদের বাড়ির উলটোদিকে হাসপাতালে ঢোকবার বেশ চওড়া একটা ফটক ছিল। হাসপাতালের একতলা, তার সামনের শান-বাঁধানো রাস্তা এবং ঘাস ভরা নাবাল জমিও দেখা যেত। পরে সে-সব বুজিয়ে বেশ মোটা উঁচু মজবুত দম আটকানো পাঁচিল তুলে দেওয়া হয়। ফলে, আগে যেমন হাতের নাগালের আত্মীয় মনে হত হাসপাতালটাকে, পাঁচিল তুলে দেওয়ায় সে অনেক দূরের, ভিনদেশি অনাত্মীয় হয়ে পড়ে। নিকট আত্মীয়কে এমন জেলবন্দী হয়ে যেতে দেখে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল খুব। আত্মীয় মনে করবার একটা সত্যি কারণ ছিল— সে সময় ওই হাসপাতালেই, দেওয়ালে গাঁথা লম্বাটে টেলিফোন বাক্সের ঠোঁটের মধ্যে পয়সা গুঁজে ফোন করতে পারা যেত। আমাদের ফোন করবার মধ্যে তখন তো দুটি মাত্র জায়গা— বড়োমামা আর বড়োপিসির বাড়ি!' নারকেলডাঙা আর যোধপুর পার্ক। যে যন্ত্রের মাধ্যমে আমরা প্রিয়মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছি, তার সঙ্গেও তো বন্ধুত্ব হবে। হয়েওছিল তাই। টেলিফোন বাক্সটির আচার আচরণ এতটাই চেনা হয়ে গিয়েছিল যে, ঠিক বোঝা যেত কখন পয়সা ফেলতে হবে। বাক্সটি অতীব সৎ— কোনো কারণে ঠিকমতো সবকিছু না হলে পয়সা বেরিয়ে আসত নিম্নাঙ্গ দিয়ে, অন্যায়ভাবে পয়সা আত্মসাৎ করেনি কোনোদিন! কয় পয়সা লাগত তখন? পাঁচ কিংবা দশ পয়সা— তার বেশি নয় নিশ্চিত। চার আনার কয়েন লেগেছে অনেক পরে।

পাঁচিল তুলে দেওয়ার ফলে, ফোন করতে গেলে আমহার্স্ট স্ট্রিটের সদর দরজা দিয়ে ঢুকতে হত। আর স্বাভাবিকভাবেই গালপাট্টা দারোয়ান আমাদের মতো না-লায়েক নাবালকদের ফোন করতে দেবার অনুমতি দিতে চাইত না। অতএব, অন্য রাস্তা ধরা হয়েছিল। একজনের কাজ ছিল গালপাট্টাকে বিভ্রান্ত করা। সেই ফাঁকে অন্য ভাই পেনাল্টি বক্সে ঢুকে পড়ত। এবং যথারীতি নিখুঁত গোল করে বেরিয়ে আসত। তখনও গালপাট্টা সমানে বকবক করছে অপর ভাইটির সঙ্গে। যাদের এত ছোটো থেকে অন্যকে বুঝিয়ে, না-বুঝিয়ে চাঁদমারিতে তির ছুঁড়ে যেতে হয়েছে সেই মুখোপাধ্যায় ভ্রাতৃদ্বয় পরবর্তীতে রাইট ভাই দুজনের মতো এরোপ্লেন আবিষ্কার করতে না পারলেও যে কাঠকয়লা কেরোসিন থেকে রেশনের লাইনে কৃতিত্ব দেখাবে তাতে তো আশ্চর্যের কিছু নেই!

হাসপাতালের দক্ষিণের দেওয়ালের গা ঘেঁষে লাট্টুপাড়া। সারি-সারি কাঠের লেদ। দোকানে লাট্টুর খোল ঝুলছে। যেমন পছন্দ কিনে নাও। বলে দাও কীরকম রং হবে লাট্টুর। সেইরকমই হয়ে যাবে। সবুজ-মেরুন চাই, হবে? হুঁ...। খোলটিকে লোহার ফলার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। এ অনেকটা ছুরি-কাঁচি শান দেবার যন্ত্র। পা দিয়ে প্যাড্‌ল করতেই লাট্টুর খোল ঘুরতে শুরু করে দিয়েছে। সেই ঘুরন্ত লাট্টুর মাথায় ধরা হল সবুজ খড়ি। নিমেষে সবুজ বৃত্ত পাকা হয়ে বসে গেল খোলের মাথায়। তারপরে মেরুন। কিন্তু এ খড়ি ঠিক মেরুন নয়। লাল আর মেরুনের মাঝামাঝি কোনো রং। তাও বসে গেল লাট্টুর শরীরে। এবং এ কোনো হেলাফেলার রং নয়।

জলে ডোবাও না লাট্টু, রং ধেবড়াবে না। দুপয়সা বেশি দিতে পারলে লাট্টুর মাথায় একটা মণিও লাগানো যায়। মণি মানে বোর্ড পিনের স্বজাতি। কিন্তু কী মনোযোগ দিয়ে লাগাতে হয়, একটু ব্যাঁকা হলেই লাট্টুর চলন বদলে যাবে। অতএব মাথার ঠিক মধ্যিখানে অলংকারটি হালকা আঙুলের চাপে সোজা লাগাও। কোনোরকমে লেগে থাকলেই হল। তারপর একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখো দশ সেকেন্ড— একদম সোজা লেগেছে তো? একটু এদিক-ওদিক মনে হলে খুলে ফেলে আবার লাগাও। নিশ্চিত? সোজা লেগেছে? এইবার তবলা ঠোকার হাতুড়ি উঠে আসবে মেকানিকের হাতে। মণির ঠিক শিয়রে হাওয়ায় আন্দোলিত হবে হাতুড়ি ধরা হাত। দুবার। লক্ষ স্থির। তারপর একটি মাত্র নিশ্চিত শব্দ— ঠক। মণি লেগেছে শিয়রে। গরিমা খুলে গেছে লাট্টুর। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, লাট্টুর আল—গোল না চৌকো? কেমন আল চাই? দমের প্যাঁচ খেলতে লাট্টুর দেহ ভারী হওয়া চাই এবং আলটি গোল এবং বেঁটে। না হলে, হালকা খোল চৌকো আল নাও, হাতের তালুর ওপর ঘোরাতে পারবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে লেত্তিটা শক্তপোক্ত, লম্বা, ভালো চাই। ঘুরিয়েই দুনিয়ার লাট্টু ভগবান হারিয়েছে লেত্তি— এইসব গানে চলে, লাট্টুর প্যাঁচ খেলতে, যেখানে লেত্তির টানটাই আসল, হারালে চলবে?

পাড়ার দাদারা অনেকেই ইয়ো-ইয়ো পকেটে নিয়ে ঘুরত। অনেকে আবার ইয়ো-ইয়ো নাচাতে নাচাতে পথ চলত। বোধহয় দাদাগিরি ফলাবার জন্যই। আমাদেরও ইয়ো-ইয়ো ছিল অবশ্যই। কিন্তু ওতে তেমন মজা নেই। লাট্টুতে অনেক অভ্যাস, আন্দাজ, শিল্পবোধ এবং বুদ্ধি লাগে। ইয়ো-ইয়ো শুধু অভ্যাস।

আমাদের পাড়ায়, খেলাধুলো, শরীরচর্চা একটা বড়ো ব্যাপার। পড়াশুনো-করো-বা না-করো, খেলাধুলো করা চাই-ই। যতদিন না চার ফুট দশ ইঞ্চি উচ্চতা পেরিয়েছি, পাড়ার হয়ে ফুটবল খেলতে যেতে হয়েছে নেবুতলা, তালতলা, কাইজার স্ট্রিট হয়ে রেলের মাঠ থেকে চালতাবাগান হেদুয়া। যারা খেলবে না তাদেরও নিশ্চয় যেতে হবে। না গেলে, দলের হয়ে গলা ফাটাবে কারা? গোলদিঘিতে সাঁতার কাটা, ওয়াটারপোলো খেলা এইসব শিখবে না, তা আবার হয় নাকি? বাবার নির্দেশ, মানতেই হবে। শীতকালে যখন সাঁতার বন্ধ, শ্রদ্ধানন্দ পার্কের ভারত সেবাশ্রম সংঘে যাও ব্যায়াম করতে, না হলে অখিল মিস্ত্রি লেনের সেল্ফ কালচার ইন্সটিটিউট— জিমন্যাস্টিক্স শেখো। পেট ভরে খাও, ব্যায়াম করো, তা হলেই সবাই ভালো থাকবে— বাবার পৃথিবী এমনই সহজ। কথার অবাধ্য হলে, খড়মপেটা। না হলে লাঠিপেটা, যা দিয়ে কাচবার আগে কাপড় ভেজানোর কাজও হয়ে থাকে। মধ্যবিত্ত বাঙালির তখন তিনটি ঘরোয়া অস্ত্র। ছেলেমেয়ে মানুষ করবার জন্য লাঠি ও খড়ম। আর চোর ঠ্যাঙানোর জন্য দরজার খিল। দরজার খিল এমনিতে বেশ শান্ত শিষ্ট ভঙ্গিতে দুদিকের আংটায় শরীর পেতে শুয়ে থাকে। কিন্তু চোর বা কোনো বেয়াদবকে ঠান্ডা করতে এর জুড়ি নেই। খিল হাতে নির্ভয়ে বদমাশের মোকাবিলা করো। মাথায় বসিয়ে দিয়ো না, রক্তপাত হতে পারে। বরং ঘা কতক লাগিয়ে দাও পিঠে, ঘাড়ে, পায়ে। চোর-বদমাশ সব ঠান্ডা। একবার এমন চোর ঠান্ডা করা হয়েছিল। পুলিশেও দেওয়া হল লোকটিকে। পরদিন স্কুলে পরীক্ষা। সমাজবন্ধু কারা? প্রশ্ন এসেছিল। অলোকের বাবা হাসতে হাসতে বললেন, সমাজবন্ধুদের মধ্যে পুলিশের নাম লিখেছ নিশ্চয়। আমি হাসতে পারিনি। লিখতে ভুলে গেছি। এমনও হতে পারে, সেই বয়সেই অবচেতনে পুলিশকে সমাজের বন্ধু মনে হয়নি।

জনশ্রুতি ও বিদ্যাসাগর

শ্যামাপ্রসাদ বসু

বিষয়টা মনে হল যখন *আরেক রকম*-এর মতো মূল্যবান পত্রিকার সীমিত পৃষ্ঠার মধ্যে জনৈক পত্রলেখকের এক দীর্ঘ মতামত। বিদ্যাসাগরের দুশো বৎসরের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বেশ ব্যঙ্গ করে মুদ্রিত হয়েছে (সংখ্যা নবম, সপ্তম বর্ষ)। বাঙালি আত্মঘাতী জাতি, একথা সবাই জানে। তা বলে 'বর্ণ পরিচয়'-এর লেখক সম্পর্কে মন্তব্য হলে কিছু তো প্রাণে লাগবেই। অবশ্য ইতিহাস বড়ো নিষ্করুণ, সে কাউকে রেহাই দেয় না। কিন্তু সেখানেও দেখতে হবে তা দৃশ্যত কতটা তথ্যসম্মত।

লেখকের দুটি বক্তব্য ('চিঠির বাক্সে' পৃ. ৫৩-৫৪, রণজিৎ অধিকারী) এখানে তুলে ধরছি।

এক, 'এই বিদ্যাসাগর যিনি অন্যের দুঃখ কষ্ট দেখলেই কেঁদে ফেলতেন, এই দৃঢ়চেতা তেজি ইন্সপেক্টর যিনি ছাত্রদের অভিযোগ পেয়ে শ্রীমকে শিক্ষকপদ থেকে বরখাস্ত করেছিলেন...'

দুই, এই অভিমানী বিদ্যাসাগর যিনি সমাজের প্রতি অভিমানে জীবনের শেষ কয়েক বছর কার্মাটাঁড়ে কাটান।'

২

১৮৮৬ সালে ২০ মে, শ্রীম অথবা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বা মাস্টারমশায়ের জীবনে ঘনিয়ে এসেছিল এক দারুণ দুঃসময়। সে বছর বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হয়নি। বিদ্যাসাগর তাঁকে ডেকে সরাসরি অভিযোগ করলেন প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ভালোভাবে পালন না করার জন্যেই এ ধরনের ফল হয়েছে। শ্রীম ছিলেন বিদ্যাসাগরে কাছে 'ঘরের ছেলে'। সেই বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে এ ধরনের অভিযোগ তিনি আদৌ আশা করেননি। আরো মর্মাহত হলেন যখন তিনি বললেন এ ধরনের খারাপ ফলাফলের কারণ হল তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ঘনঘন যাতায়াত। মাস্টারমশায় প্রচণ্ড দুঃখবোধ নিয়ে ঘরে ফিরে এলেন। বাড়িতে ফিরে এসে গভীর চিন্তা করে শেষ পর্যন্ত ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দিলেন।

মহেন্দ্রনাথের চারিত্রিক ঔদার্য এত বিশাল ছিল যে বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে এই অপ্রত্যাশিত আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও তিনি 'কথামৃত'-এ বিদ্যাসাগরের সম্পর্কে একটিও অপ্রিয় উক্তি লিপিবদ্ধ করেননি। অথচ 'কথামৃত' প্রকাশিত হয়েছিল বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর (১৮৯১) পর ১৮৯৭ সালে (ইংরাজি সংস্করণ)।

অবশ্য একথা ঠিক, মাস্টারমশায় প্রায়ই অসুস্থ, গলায় ক্যান্সারে আক্রান্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে সময় দিতে গিয়ে অথবা তাঁর কোনো আনন্দের শরিক হতে গিয়ে স্কুলে নির্দিষ্ট সময়ে হাজিরা দিতে পারেননি। দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

১৮৮২ সালের ১৫ নভেম্বর গড়ের মাঠে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গী হয়ে সার্কাস দেখতে গিয়ে তিনটের সময় স্কুল পরিত্যাগ করেছিলেন। অথচ সাধারণভাবে স্কুল ছুটি হয় বেলা চারটের সময়ে। অন্যদিকে স্কুল যখন শুরু হত সাড়ে দশটার সময় তখন তাঁকে প্রায়ই দেখা যেত বেলা দশটার সময়েও বলরাম মন্দিরে। আবার ২৯ অক্টোবর (১৮৮৫) বৃহস্পতিবার সকালে তাঁকে দেখা যাচ্ছে ডা. মহেন্দ্রলাল সরকারের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের অসুখের রিপোর্ট নিয়ে যেতে। ডাক্তার তাঁকে বললেন, 'তাঁর সঙ্গে থাকতে। উত্তর কলকাতার বিভিন্ন রোগী দেখার পর মাস্টার মশায়কে নিয়ে সবশেষে ডা. সরকার গেলেন রামকৃষ্ণকে দেখতে।' 'কথামৃত'তে কোথাও লেখা নেই সেদিন তিনি স্কুল থেকে ছুটি গিয়েছিলেন না দেরি করে স্কুলে গিয়েছিলেন? (দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ২১৬-২১৭)

আবার অন্যদিকে প্রশাসনিক হিসেবে বিদ্যাসাগর ছিলেন বরাবরই জাঁদরেল। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীন ক্লাস রুমের পাশে সবার অগোচরে দাঁড়িয়ে থাকতেন। দেখতেন শিক্ষক ও ছাত্ররা নিয়মমাফিক ক্লাসরুমে ঢুকছেন কিনা? মহেন্দ্রনাথ বা শ্রীম'র স্কুলেও মাঝে মাঝে হঠাৎ পরিদর্শনে যেতেন। ২৬ সেপ্টেম্বর (১৮৮৩) বিকেলের আগে মাস্টারমশায়কে হঠাৎ হাজির হতে দেখে রামকৃষ্ণ জিজ্ঞেস করলেন, 'স্কুল নাই?' মাস্টারমশায় বললেন, 'আজ স্কুল দেড়টার

সময় ছুটি হয়ে গেছে। কারণ বিদ্যাসাগর এসেছিলেন। স্কুল বিদ্যাসাগরের, তাই তিনি এসে ছেলেদের আনন্দ করবার জন্য ছুটি দেওয়া হয়।' ('কথামৃত': দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ৬৫)

উপরোক্ত ঘটনাগুলি থেকে মনে হয় বিবেকি মাস্টারমশায় নিজের অনিয়মানুবর্তিতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। আর ছাত্রদের অভিযোগকে বিদ্যাসাগরের পক্ষে অগ্রাহ্য করা সম্ভব ছিল না।

৩

এবার এল কার্মাটাঁড়— 'কার্মাটাঁড়, 'কার্মাটাঁড়' করে বাঙালি গেল! অবশেষে বিদ্যাসাগরকে শেষ বেলায় কার্মাটাঁড়ে পাঠিয়ে বাঙালি নিশ্চিন্ত হল। ভাবা যায় এত বড়ো একজন বিপজ্জনক ব্যক্তি ইংরাজ-শাসিত কলকাতার মতো বেগম-বাইজি, নৃত্য-গীত মুখরিত শহরে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অতিবাহিত করবেন তা হলে তো নৈতিকতার সর্বনাশ হবে? কারণ শিশুকাল থেকে ছেলে মাথা নেড়ে নেড়ে বড়ো হবে এই কথা বলে— গোপাল বড়ো সুবোধ ছেলে! সদা সত্য কথা বলিবে। না বলিয়া পরের দ্রব্য লইবে না এবং সবশেষে পিতা-মাতার কথা শুনিবে। এসব কথা বড়ো হয়েও মনে রাখলে তো বাঙালির সব গেল! তার চেয়ে ভালো হল, জীবনের শেষ দিনগুলি সাঁওতাল পরগনার অন্তর্ভুক্ত সুদূর কার্মাটাঁড়ে যদি তিনি শান্তির শেষ নিশ্বাস ফেলে থাকেন! সেই সঙ্গে বাঙালিও হাঁফছেড়ে বাঁচল! চোখের সামনে তাঁর আর সৎকারের স্মৃতি ও স্থান রইল না।

৪

কল্পনায় মিশ্রিত বাঙালির উপরোক্ত বক্তব্য কিন্তু বাঙালি চরিত্রের প্রকৃত সত্য উদঘাটিত করে না। বাঙালি বরাবরেই ভাবপ্রবণ, গুণীর সমাদর করে এবং সত্য অপ্রিয় হলেও বলতে দ্বিধা করে না। বিদ্যাসাগরের মতো মানুষকে সে কখনোই দেশান্তরি হতে দেবে না। কার্মাটাঁড় যাওয়ার পিছনে বিদ্যাসাগরের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল শরীর সারানো ও ক্লান্তি অপনোদন করা এবং অবসর সময়ে সাঁওতালদের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হওয়া।

বিদ্যাসাগরের স্বাস্থ্য কোনোদিনই ভালো ছিল না। ছোটোবেলা রক্ত আমাশয় রোগে প্রায়ই ভুগতেন। তার উপর ঘোড়ার গাড়ি থেকে পড়ে হঠাৎ এক দুর্ঘটনার সম্মুখীন হলেন যা কিনা কিছুদিনের মধ্যে যকৃতের ক্যানসারে রূপান্তরিত হয়।

কলকাতায় বিদ্যাসাগর কখনোই একাকিত্বে ভোগেননি— সুতরাং একাকিত্ব মোচোনের জন্য তাঁর সাঁওতাল পরগনায় যাওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না, একমাত্র উন্নত পানীয় ও আবহাওয়া ছাড়া। কলকাতায় তাঁর শারীরিক স্বাস্থ্যের অবনতির সংবাদ বিদ্বজ্জনদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। প্রথিতযশা উকিল শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য বিদ্যাসাগরকে দেখতে এলেন। পরামর্শ দিলেন, 'আপনি কার্মাটাঁড়ে গেলে ভালো থাকেন। আর সেখানে আপনার বিশ্রামও হয়। কিছুদিন সেখানে গিয়ে থাকুন না।'

বিদ্যাসাগর উত্তর দিলেন, 'আমার পক্ষে আজকাল সবই সমান। সেখানেও বড়ো ভালো থাকি না।' যা বললেন না, তা হল সাঁওতালদের অবর্ণনীয় দারিদ্র্য তাঁকে রোগাক্লিষ্ট শরীরে আরো মানসিক কষ্ট দেবে।

তা ছাড়া কলকাতার যুব সমাজে তাঁর জনপ্রিয়তা হ্রাস তো দূরের কথা বরং বৃদ্ধির দিকে এগোচ্ছিল। তরুণ বুদ্ধিজীবী শিবনাথ শাস্ত্রী। জোর গলায় বলে বেড়াতেন, 'আমি বিদ্যাসাগরের চেলা'। মেট্রোপলিটন কলেজে তাঁর শিক্ষক পেতেও কোনো অসুবিধা হয়নি। ১৮৭৪ সালে তাঁর এক সময়ের সহপাঠী দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তাঁকে মনে করে উৎসর্গ করেছেন তাঁর লেখা বই 'বিশ্বেশ্বর বিলাপ'। উৎসর্গপত্রে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন, 'বাল্যাবধি আমি তোমার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা অসামান্য দয়া দাক্ষিণ্য মুক্ত হস্ততা মহানুভবতা পরোপকারিতা এ গুণের সবিশেষে পরিচয় পাইয়া আসিতেছি।'

জীবনের শেষে অসুস্থ অবস্থায় যখন তিনি চন্দননগরে বিশ্রাম নিচ্ছেন, সেখানেও কলকাতা থেকে সাক্ষাৎপ্রার্থীদের ভিড়ের শেষ নেই। এক সময়ে মন্তব্য করে ফেলেধিলেন, 'লোকের জ্বালায় যাই কোথায়?'

তাঁর জীবনের শেষ দিকে বৃদ্ধদের চেয়ে তরুণরা তাঁকে বেশি ঘিরে থাকতেন। নবীনচন্দ্র সেন ছাত্র বয়সে তাঁর স্নেহ ও আর্থিক সাহায্যের কথা স্মরণ করে যেমন তাঁকে 'পলাশীর যুদ্ধ' উৎসর্গ করেছেন, তেমনি শুধু শিবনাথ নন, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, ক্ষুদিরাম বসু, শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে তিনি ছিলেন অবারিত খোলা দরজা। কিশোর বয়সে বাংলায় 'ম্যাকবেথ'-এর অনুবাদ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। বুঝতে পারছেন না কাকে দেখালে ঠিক না ভুল বোঝা যাবে। চলে গেলেন সটাং বিদ্যাসাগরের কাছে। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'বোধ করি কিছু উৎসাহ সঞ্চয় করিয়া ফিরিয়াছিলাম।'

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় বিদ্যাসাগরের সমালোচনা করে দারুণ বিপাকে পড়ে গেলেন বঙ্কিমচন্দ্র সারা বাংলায় হইচই পড়ে গেল। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' (২৬ জুন, ১৮৭৬) লিখল, 'বিদ্যাসাগর মশাই দেশ পূজ্য ব্যক্তি'। বঙ্কিমচন্দ্রকে জনমতের কথা চিন্তা করে সমালোচনার অংশটি বাদ দিতে হল পুর্নমুদ্রণে। (বিবিধ প্রবন্ধ, দ্বিতীয় ভাগ)। মনে রাখা প্রয়োজন ১৮৭৬ সালে 'ভারত সভা' প্রতিষ্ঠিত হলে সভাপতিত্ব করার প্রস্তাব তাঁকেই প্রথম দেওয়া হয়েছিল। ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য সে অনুরোধ তিনি রাখতে পারেননি। ১৮৮৮ সালে স্ত্রী দিনময়ী দেবীর মৃত্যুর পর

বিদ্যাসাগর আর কখনো কার্মাটাঁড় যাননি। তার পরেও তিনি তিন বৎসর বেঁচেছিলেন।

১৮৯১ সালের প্রথমের দিকে গঙ্গার ধারে ফরাসডাঙায় বিদ্যাসাগর স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য কিছুদিন কাটিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানেও স্বাস্থ্যের উন্নতি না হওয়ায় তিনি কলকাতায় তাঁর বাদুড়বাগানের বাসায় ফিরে এলেন। অ্যালোপাথি, আয়ুর্বেদীয় এবং ইউনানি কোনো চিকিৎসাতেই কোনো ফল হল না। ২৫ আষাঢ় (১২৯৮ বাং সন) সাহেব ডাক্তার সালজার বিদ্যাসাগরকে ভালোভাবে পরীক্ষা করে রায় দিলেন পাকস্থলীতে টিউমার হয়েছে। নিরাময়ের আশা খুবই কম। ১৩ শ্রাবণ বিকেল থেকে বিদ্যাসাগরের শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। রাতে নটা নাগাদ তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন এবং রাত আড়াইটার সময়ে চিরকালের মতো তাঁর বাদুড়বাগানের বাসায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৮৯১ সালের ২৯ জুলাই গোটা দুঃখজনক ঘটনাটি ঘটেছিল কলকাতায়। সুতরাং তথাকথিত কার্মাটাঁড়ের গল্পও এখানেই শেষ।

কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিবেকের মতো

অতনু ভট্টাচার্য

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত তাঁর 'বীরেনদা' কবিতাটির শেষ চরণে লিখেছিলেন— 'বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমাদের বিবেকের মতো...'। অলোকরঞ্জনের পরেও এই কথাটির সত্য যে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে, এ কথা দ্বিধাহীন ভাবে বলা যায়।

প্রথমে একটি মীমাংসার মধ্য দিয়ে এই নিবন্ধের উৎসমুখটিকে চিহ্নিত করব। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে কেউ কেউ প্রেমিক কবি বলে থাকেন আবার অনেকে বলেন তিনি প্রতিবাদী কবি। আসলে প্রেম ও প্রতিবাদের দূরত্ব রচনা এক অস্বচ্ছ ভাবনা। প্রেমকে দয়িত-দয়িতায় আবদ্ধ রাখা যে প্রেমের প্রতি অবিচার একথা আমরা যত তাড়াতাড়ি বুঝে ফেলব ততই মঙ্গল। মানবমুক্তির চিন্তা যে একজন অবিচল প্রেমিকের, এই কথাই মূলত স্পষ্ট করে বলতে চাই। কবি লেখেন—

ছত্রিশ হাজার লাইন কবিতা না লিখে
যদি আমি সমস্ত জীবন ধরে
একটি বীজ মাটিতে পুঁততাম
একটি গাছ জন্মাতে পারতাম
যে গাছ ফুল ফল ছায়া দেয়
যার ফুলে প্রজাপতি আসে, যার ফলে
পাখিদের ক্ষুধা মেটে;

ছত্রিশ হাজার লাইন কবিতা না লিখে
যদি আমি মাটিকে জানতাম

(মহাদেবের দুয়ার)

এই কবিতায় কবি মানুষের মুক্তিকেও পেরিয়ে মনুষ্যেতর জীবের প্রতিও তাঁর ভাবনার যে প্রকাশ ঘটালেন তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি একারণেই যে এটি একটি খাঁটি প্রেমেরই কবিতা। বলা ভালো মহাপ্রেমের কবিতা। এই তো মানবীয় প্রজ্ঞার সৌন্দর্য! কবিতাকে স্লোগান করে ফেলা ব্যর্থতা আর এই কবি তো জানতেন স্লোগানকেও কীভাবে কবিতায় রূপান্তরিত করা যায়—

অন্ন বাক্য অন্ন প্রাণ অন্নই চেতনা;
অন্ন ধ্বনি অন্ন মন্ত্র অন্ন আরাধনা।

এবং শেষ দু-লাইন:

সে অন্নে যে বিষ দেয় কিংবা তাকে কাড়ে
ধ্বংস করো ধ্বংস করো ধ্বংস করো তারে।

(মুখে যদি রক্ত ওঠে)

যে কবি সর্বার্থে স্বাধীন তাঁর চলাচলের শক্তি জোগাবে মেধার আবেগ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পাঠে এই কথাই মনে হয়। কবির জন্ম ১৯২০, বিক্রমপুর, ঢাকায়। সেই ১৯২০ সাল যখন থেকে গান্ধী ও ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন সংগঠিত করে তোলেন। বীরেন্দ্র, অনুশীলন সমিতি ও পরবর্তীকালে সাম্যবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত ও যুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৩৫, ২১ জুন প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের ফ্যাসিস্ট বিরোধী আন্তর্জাতিক সম্মেলন। ভারত থেকে যোগ দিয়েছিলেন শ্রীমতী সোফিয়া ওয়াডিয়ার। দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫)। মন্বন্তর (১৯৪৩)। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু (১৯৪১)। গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং (১৯৪৬, ১৬ আগস্ট)। স্বাধীনতা ও দেশভাগ (১৯৪৭, ১৫ আগস্ট)। এত ঘটনাবহুল সময় যেন প্রতিটি ঘটনার অভিঘাতেই নড়ে উঠছে মানবতার ভিত। এলিয়ট, এজরা পাউন্ড, এডগার অ্যালান পো, হুইটম্যানের কবিতাও যে সেই সময়ের বাংলা কবিতাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল এসব কথা আজ আর নতুন কোনো কথা নয়। ত্রিশের দশকের কবিদের মেধাসর্বস্বতার মুখোমুখি জীবনানন্দই তাঁর কবিতায় বোধ-রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের সমাহার ঘটিয়ে এবং মূলত অক্ষরবৃত্তের শিথিল বুননের মধ্য দিয়ে বাংলা কবিতাকে নতুন জীবন দিয়েছিলেন। পরবর্তী দশকে দিনেশ দাস, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চটোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ কবিদের কবিতায় প্রগতি সাহিত্যের অঙ্গীকার। তাঁর জন্মশতবর্ষে

বর্তমান নিবন্ধের কেন্দ্রে যেহেতু কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাই তাঁর আত্মপ্রকাশের দিনগুলোর কবিতার দিকে তাকালে দেখব, জীবনানন্দের প্রচ্ছন্ন প্রভাব।

তুমি মোরে কানে কানে কয়েছিলে: 'ভালোবাসিয়াছি।'—
(তুমি মোরে কানে কানে)

বা,

তুমি কয়েছিলে কথা! আজ আমি কথা কহিতেছি;

যদিও এই প্রভাবটিকে বীরেন্দ্র অতিক্রম করে ফেলেছিলেন অতি দ্রুত, ঠিক যেমন করে জীবনানন্দ অতিক্রম করেছিলেন অগ্রজ নজরুলের প্রভাব। তবে এ সব কথা উঠছে কেবল কবিকে পূর্বাপর চিনতে চাওয়ার জন্যই। তাঁর রাজনৈতিক জীবন পর্যালোচনা করে দেখা যায় তিনি মনুষ্যত্বের পক্ষে, নিপীড়িত মানুষের পক্ষকে দ্বিধাহীনভাবে সমর্থন করছেন। অকপট সত্যের সারল্যে তাঁর কবিতা তাই দৃঢ় ভিত্তি পেয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির পক্ষে খুবই বেমানান এই কবি কারণ তিনি প্রশ্ন করেন, প্রশ্ন করে যাওয়াই কবির কাজ মনে করেন। রাষ্ট্রের বা পার্টির ফতোয়া অনুসারে তাই তাঁর কলম চলেনি। বরং 'সোশিয়াল রিয়ালিজম'-এর ধারণাটি যেন তাঁর চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছিল। একটা কথা খুব জোরের সঙ্গে এখুনি বলতে চাই, এই পর্বের কবিদের মধ্যে সুকান্ত ও বীরেন্দ্র-ই তাঁদের কবিতাকে অন্যদের থেকে অনেক বেশি মানুষের কাছে এনে ফেলতে পেরেছিলেন। অনেকেই হয়তো বলবেন যে সুকান্ত ও বীরেন্দ্রর কবিতা বড়ো সোজাসুজি, শিল্পিত-আড়ালের অভাব ইত্যাদি। সেক্ষেত্রে বলবার কথা এই যে বীরেন্দ্রর অনেক কবিতাই কিন্তু শিল্পিত আড়ালকে মান্য করেই লেখা হয়েছে। যদিও সুকান্ত প্রকাশ্য দিবালোকের মতো তাঁর কবিতাকে জনগণমনের দুয়ারে আনতে চেয়েছিলেন অত্যন্ত সচেতন ভাবে।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আবার যখন লেখেন—

কবিতা,
তুমি কেমন আছো?

যেমন থাকে ভালোবাসার মানুষ
অপমানে।

(আমার)

স্পষ্টতাই যেন আড়াল। এই কবিতাটিকে 'কবিতা', 'ভালোবাসার মানুষ', 'অপমানে' শব্দ তিনটি কত সহজেই এসেছে, এসেই কিন্তু ফুরিয়ে যায়নি। থেকে গিয়েছে মুখর ও প্রাঞ্জল ইঙ্গিতে। ভাবনা যখন শাশ্বতকে ছুঁয়ে ফেলে, যখন 'কবিতা' আর 'ভালোবাসার মানুষ' এক হয়ে যায়, কবিতার অপমানে যখন কবি বিদ্ধ, সেই তুঙ্গ মুহূর্তেই, আমরা নানাবিধ কাব্যসংস্কার অতিক্রমী কবিতার হীরকখণ্ডের দেখা পেয়ে যাই। কবিতা তখন শুধুই কবিতার ধর্মে অচঞ্চল।

আমরা অবাক হই, তাঁর কবিতায় বক্তব্য কেমন অনায়াসে রসমূর্তি লাভ করে! কবির সমাজচেতনা যেহেতু আরোপিত নয়, হৃদয়জাত, তাই তাঁর কবিতা হয়ে ওঠে মননশীল। আমরা লক্ষ করি ভাষা ও ভাবের নিবিড় সামঞ্জস্য। তাঁর এই শিল্পিত বাস্তবতা আমাদের বোধকে নাড়া দেয়। শিল্পের বাস্তবতার শর্ত তার বিশ্বাসযোগ্যতা। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই শর্ত পালন করতে চেয়েছিলেন প্রতিটি অক্ষরে। তাঁর কবিতার মর্মে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে আছে দ্রোহ ও প্রেম, প্রশ্ন ও প্রত্যয়। কয়েকটি কবিতার উল্লেখ করছি—

আমরা হাসতে চেয়েছিলাম।

সেই হাসির গল্প
আজ লবণের পাহাড় হ'য়ে
আড়াল করেছে আমাদের স্বপ্নকে।

(হাসির গল্প)

বা,

শ্রীমতী, তোমাকে স্থির নদী ভেবে
কারা জল তুলতে এসেছিল?
তারা কি জানতো না, জলে শীত লেগে আছে?

গভীর ঘুমের মতো তোমার শরীর জুড়ে
অন্ধকার...
তারা জল তুলতে এসেছিল!

(জল তুলতে এসেছিল)

বা,

কোথাও মানুষ ভাল র'য়ে গেছে বলে
আজও তার নিঃশ্বাসের বাতাস নির্মল।
যদিও উজীর, কাজী, নগর-কোটাল
ছড়ায় বিষাক্ত ধুলো, ঘোলা করে জল

তথাপি মানুষ আজও শিশুকে দেখলে
নম্র হয়, জননীর কোলে মাথা রাখে,

বা,

শব্দগুলি পাথরের নৈঃশব্দ্য জেনেছে

পাথর দিয়ে কি কেউ মূর্তি গড়বে?
কোথায় সে শীলভদ্র, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান? চারদিকে
সমুদ্রের মৌন; আমরা প্রতীক্ষায়
স্থির বসে আছি

এক আঁধার থেকে অন্য গভীর অপ্রেমে,
পরবাসে।

(সমুদ্রের মৌন)

কত কবিতার কথাই বলা যায়, যেমন, 'মহাদেবের দুয়ার', 'রাত্রি, কালরাত্রি', 'বর্ষা', বেকার জীবনের পাঁচালি', 'ন্যাংটো ছেলে আকাশ দেখছে', 'নচিকেতা', 'ভুবনেশ্বরী যখন' এমন আরো অনেক কবিতা পড়তে পড়তে কবির সুচেতনাকে আমরা অনুভব করতে পারি। কবির আবেগমথিত আত্মা, মননশীল হৃদয় ও অনুভূতিময় মনকে আবিষ্কার করতে গিয়ে আমরা নিজেরাই যেন একটু একটু করে আবিষ্কৃত হই তখন!

সত্য উচ্চারণে তিনি কখনওই আড়ষ্ট নন। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বন্ধু হলেও কবি 'বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শিল্প-বিবেক তবু এভাবেই প্রকাশ পেয়েছে—

হেইও হো! হেইও হো!
পোশাক ছাড়া, নীরেন! আমরা
সবাই যে ন্যাংটো!
আমরা সবাই রাজা আমাদের এই
রাজার রাজত্বে।
সবাই যে ন্যাংটো!
আমরা সবাই রাজা আমাদের এই
রাজার রাজত্বে।

কিন্তু তুমি বুঝবে কি আর;
তোমার যে ভাই মাইনে বেড়েছে!

(নীরেন তোমার ন্যাংটো রাজা)

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শুধু পথিক নন, তিনি পথকারও। পরবর্তী প্রজন্মের কবিদের তিনি প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। গ্রহণে সক্ষম সেই সব কবির রচনার ভেতর তিনি আছেন, মেজর কবিরা ঠিক যেভাবে থাকেন।

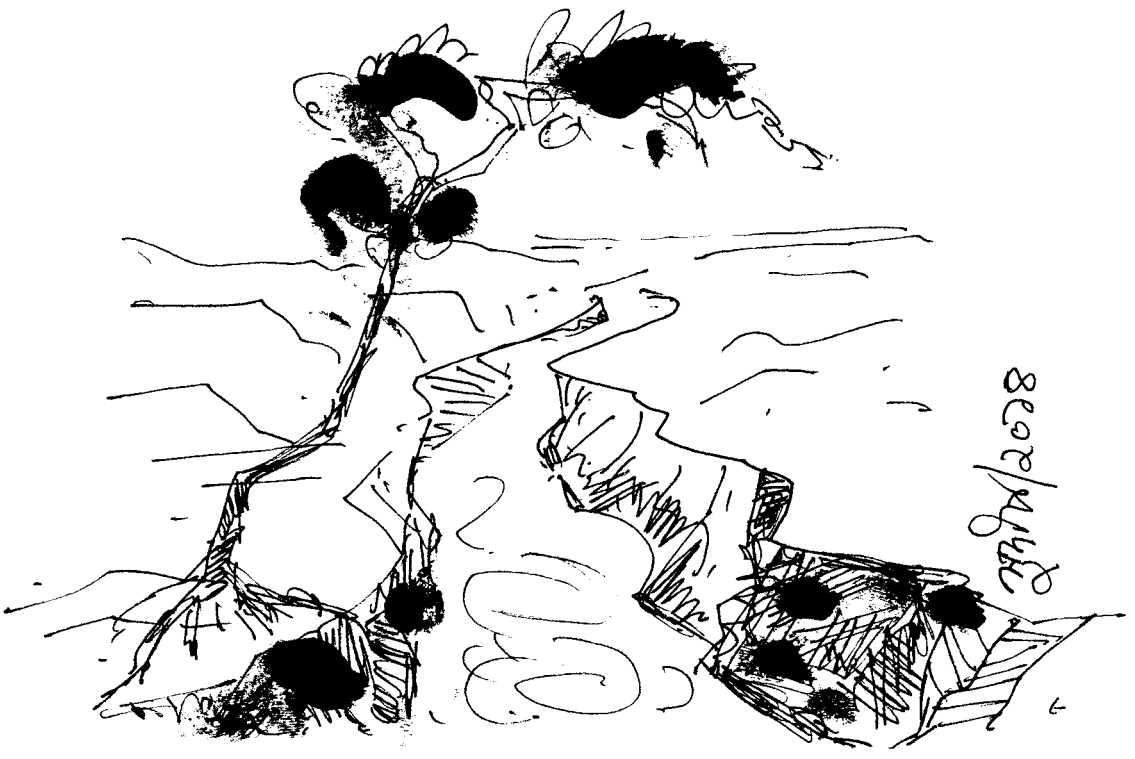

খেজুর রসে খেজুরে আলাপ

গৌতমকুমার দাস

বউবাসন্তী, সীতাহরণ, ছোটোদের খেলা, গাঁয়েঘরে মেয়েদের। এই খেলায় বিশ পঁচিশ ফুট দূরে দুটি গণ্ডি, একদিকে সীতা বউ, অন্যটিতে তারই দলের অন্যরা, গণ্ডির বাইরে প্রতিপক্ষ দল। খেলায় যে কোনো বুলি ডাক দিতে দিতে প্রতিপক্ষকে তাড়া, ও ছোঁয়া, ছুঁতে পারলেই সে বসে যাবে, খানিক কাবাডির মতো, আর সীতা সুযোগ বুঝেই তার গণ্ডি থেকে এক দৌড়ে অন্য গণ্ডিতে, তা হলেই দলের জিত। বউবাসন্তী বা সীতাহরণ খেলায় একটানা ডাক বা বুলিতে ওস্তাদ কবিতা, তার বুলি ‘খেজুর পাতা লটরপটর বউ এসেছে ঝটর পটর’, যখনই সে খেলায়, প্রতিপক্ষকে তাড়া করতে করতে দৌড়োয়। সেই কবিতা এক দিন লাল পেড়ে ডুরে শাড়ি, চলে শ্বশুরবাড়ি। তার চলে যাওয়ার দিনে, আড়চোখে, খেলার মাঠের দিকে একবার, যেখানে গণ্ডি, নিশানা খেজুর গাছ, পাশেই, পুকুরের গা ঘেঁষে, খেলা শেষে ওখানেই আড্ডা, একসঙ্গে। কবিতার ক্লাস ফোরের পরীক্ষা আর দেওয়া হয়নি, আমিও ক্লাস ফোর, ওর সঙ্গেই। ক্লাস ফোরে শেষ প্রাইমারির দেয়াল, কিন্তু পরীক্ষা, সরকারি ব্যবস্থাপনায়, নাম সেন্টার পরীক্ষা। সেন্টার পরীক্ষা, সত্তরের দশকে, দুটো করে বিষয় ফি-দিন, মাঝে টিফিন। টিফিনে ঢেঁকি-ছাঁটা ভিজে চিঁড়ে, সঙ্গে খেজুর গুড়, আর আস্ত একটা খেজুর। ওই খেজুর, কিছুটা খেজুর গুড়, নীলকণ্ঠের, আমার পাতে, খাতা দেখে লেখার বিনিময়। নীলকণ্ঠ খাতা দেখে কী লিখত ওই জানে, কিন্তু পাশ হয়নি, পড়ায় ছেদ, ক্রমে ওর বাপের অ্যাসিস্ট্যান্ট, পুরুতগিরি। এখন সে গাঁয়ের ডাকসাইটে বামুন, বিয়ে মুখেভাতে শ্রাদ্ধ পুজোয়, হরিসভায় নারায়ণশীলায়। পরীক্ষায় পাশ না করায় ওর মনে কতটা খেদ, জানা নেই, কিন্তু পরীক্ষার তিনদিন তিনটি খেজুর, খেজুর গুড়, পাত-চালান, আজও মনে, গভীরকোণে। নীলকণ্ঠের পুরুতগিরির সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে আমার একটার পর আরেককটা ক্লাস, মাধ্যমিক পাশ। উচ্চমাধ্যমিকে গাঁ-ছাড়া, অন্যস্কুলে, অন্য গাঁয়ে, বাড়ি ছেড়ে স্কুল হস্টেলে, সেই শুরু, বাকিটাও হস্টেল। হস্টেল সুপার কড়া ধাতের, তাঁর কাছে আমি, তাঁর কথায় ডিসিপ্লিনড, মোস্ট ওবিডিয়েন্ট। সেই হস্টেল সুপারের কাছে একদিন, ধরা পড়তে পড়তে, ধরা পড়িনি। এত ভোরে এমনটা হওয়ার কথা নয়, হঠাৎই হস্টেল সুপার, সামনাসামনি, তিনি তাঁর প্রকৃতির ডাকে। আমার চাদরের তলায় তখন আস্ত একটি মাটির কলস, মাঝারি আকার, খেজুর রসের, তখন শূন্য। খেজুর রস ভরতি মাটির কলস, সাবাড় হস্টেলে, দোতলায় চার ঘরে, সবাই মিলে, ভাগাভাগি, সাম্যবাদ, সবার জন্য এক গ্লাস, সিলের গ্লাসের মালিকানা সহদেবের, বন্টনে মোহিনী, এই অধীন বাহকমাত্র। গাছ পাড়া খেজুর রস, চাকভাঙা মধুর থেকেও, সহদেবের বয়ান। ওই গাছে ওঠে, কলস খোলে, ভোররাতে, ফের বেঁধে আসে, নিয়মিত। তবে সবেরই নিয়ম আছে, কনকনে ঠান্ডা ছাড়া খেজুর রসে আশ মেটে না। কুয়াশা যেদিন, রস ঘোলাটে, মিঠে নয়, রসভাঙা খেলায় সেদিন ইতি। স্বাদ আনে এক কাঠির রস, শিউলি যেদিন গাছের গা (একদিকে) মসৃণ করে কলসি বাঁধে। কলসি নামিয়ে নতুন কলসি বেঁধে দিলে দোকাঠি রস মেলে, তেমন ভালো নয়, ওই রসে গুড়ও ভালো হয় না। খেজুর রস পেতে, কাঠি একটি জরুরি, বাঁশ থেকে কেটে, সুচালো দিকটা খেজুর গাছের মসৃণ অংশে অলতো করে গেঁথে, ওর থেকেই রস, টপটপ, কলসিতে, গাছের তলায় দাঁড়িয়েও সেই শব্দ কানেকানে, গতিধারা। অন্যের গাছে, শিউলির বন্দোবস্তে, তিন সের গুড়, ফি-মরসুম, বাপ-ঠাকুরদার আমল থেকে, এমনটাই চল। খেজুরগাছ মসৃণ করে রস পেতে হলে খেজুর পাতা ছাঁটতেই হয়, ওসব শিউলির প্রাপ্য, খেজুর রস জ্বাল দিতে কাজে আসে। রস জ্বাল দিতে দিতে, একসময় হালকা বাদামি বা লালচে, কাঠিনীভবন, নলেন গুড়। নলেন গুড় তুলে ভাঁড়ে ভাঁড়ে, বাকিটায় কাঠের হাতার মাজন, মাজতে মাজতে শিল্পী শিউলির হাতের কাজে দানা ওঠা গুড়, গরম গরম আটার রুটির সঙ্গে, আহা, স্বর্গীয়! ওহো, শিউলি, যে খেজুর গাছ মসৃণ করে, কলসি বাঁধে, নামায়, রস জ্বাল দেয়, গুড়-পাটালি ইত্যাদি বানায়। রস জ্বাল দেওয়া উনুন লাগোয়া ছোটো বড়ো গর্ত, আসলে ছাঁচ মাটি লেপে মসৃণ, উনুনের আঁচে শুকনো ঠকঠকে,

তাতেই গরম গুড়, ডাবুরে তুলে তুলে, ঠান্ডা হলেই পাটালি, অবিকল ছাঁচের আকারে। খেজুর রসের গুড়, প্রতি বছরই, শুধু শীতে। প্রতি গাছ মসৃণে, বিপ্রতীপে, মাথার পানে, গাছ শীর্ণকায়া, মাথায় ডালপালায় ঝাঁকড়া। মাথার অতটা ভার সইতে পারে না গাছ, তা ছাড়া বয়স, একসময় শুকোয়, অথবা ভেঙে পড়ে ঝড়ে। ঝড়ের কথা এলেই, আইলা সিডর বুলবুল এসবে, আঠারো মাথার এক খেজুর গাছের কথা না এসে পারে না। এমনই এক জড়ে সে ধরাশায়ী, অবশেষে ভূমিপতন। এককালে এর সুখ্যাতি, সুদিন, কত লোকে দেখতে আসে, বকখালি বেড়াতে এলেই। ভ্যান-রিকশাওয়ালা ট্যুরিস্ট দেখতে পেলেই, হেঁকে ডেকে, আট-দশটাকা ভাড়ায়, মন্দ কী! বকখালি বাসস্ট্যান্ডের কাছেই, আমি হেঁটে বহুবার, তখন প্রতিমাসে বকখালি, অন্তত একবার হলেও, কাজে। তখন ওকে, একবারটি হলেও, প্রতিবারই। বছর বছর যে পরিবর্তন, সামাজিক, শেষমেষ গাছটির মালিক, আঠারো মাথা ঈশ্বরের সৃষ্টি, এইভেবে, সিঁদুর লেপে, বাক্স বেঁধে, উপার্জনে। অথচ জাতে সে খেজুর গাছ, আর্যদের খর্জুরম, বিলিতি সাহেবদের ডেট পাম, পোশাকি নামে ফিনিক্স ড্যাকটিলিফেরা। প্রকৃতি তালের, শাখা প্রশাখায় নেই, এ গাছের ফল মানুষে, তবে শেয়ালে-ভামে বেশি। খেজুর গাছের নীচে, দু-চারজন বসলে, তর্ক জুড়লে, নির্ঘাত বিপ্লব, বিষয়ে যা খুশি, তখন সে সেমিনার, এক প্রকার আন্তর্জাতিক, শিরোনাম— খেজুরে আলাপ। এমন আলাপের সাথি, না, আমার তেমন কেউ, বরং খেজুর গাছের কাছে, জগৎ সংসার ওলটপালট, মনে আহ্নিক গতি, খেজুর কাছে হাঁড়ি বাঁধো মন, নইলে রস গড়িয়ে গোড়া পচে অকালে হবে মরণ...'। ওই খেজুর রস থেকেই নলেন গুড়, যার থেকে জয়নগরের মোয়া। কনকচূড় ধানের খই, গাওয়া ঘি-র সঙ্গে, খেজুরের নলেন গুড়, ক্ষীর পেস্তা কাজুবাদাম কিসমিস ও পোস্ত দিয়ে তৈরি জয়নগরের মোয়া তৈরির জন্য জিরেন কাঠের অর্থাৎ কয়েকদিন গাছকে রসদান থেকে বিরত রেখে, তবে যে খেজুর রস, তার থেকে নলেন গুড় হওয়া চাই। জিরেন কাঠ থেকে মেলা রস দিন তিনেক রেখে, ঢিমে আঁচের জ্বালে তৈরি নলেন গুড়, ওই গুড় না হলে জয়নগরের মোয়া সুবাস ছড়ায় না।

শুধু রসে নয়, খেজুর গাছ গুঁড়িতেও, বেশ শক্তপোক্ত। গরিবের ঘরে মাটির কাঁথ (দেয়াল), কাঁথের ওপর আড়াআড়ি আধচেরা খেজুর গাছের গুঁড়ি, আসলে কড়ি। তাতে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো কাঠামো, তার ওপর খড়ের ছাউনির চাল। খেজুর-কড়ি বেশ টেকসই, খড়ের চালের বার তার ওপর, ঝড়ে চাল ওড়ে, কিন্তু কড়ি নড়ে না। খেজুর গুঁড়ি কাজে আসে গাছ বুড়োলে, কিন্তু যৌবনে, ফি-বছর শুধু খেজুর রস নয়, তার পাতা, ভ্যান-রিকশা ভর্তি, শহরে চালান, ঝাড়ন তৈরিতে। খেজুর পাতার শীতলপাটি, মেয়েরা বোনে, দুপুরবেলায়, অবসরে। মাটির মেঝেয় শীতলপাটি, গ্রীষ্মে দুপুরবেলায়, আরাম, আরেকরকম।

বাজারি খেজুর এ দেশের নয়, আরবদেশীয়। খেজুর খেতে বেশ, আছে পুষ্টিগুণও। ক্যালসিয়াম সালফার আয়রন পটাশিয়াম ফসফরাস ম্যাঙ্গানিজ কপার ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি থাকায় খেজুর খাওয়া যায় বছরভর। রমজান মাসে দীর্ঘ উপবাসে শরীর জুড়ে ক্লান্তি খেজুরে জুড়োয়, সঙ্গে ঘাটতি কমে গ্লুকোজের, ইফতারে তাই খেজুর অবশ্য ভোজ্য। মোটাসোটা চেহারার মানুষজনের ওজন কমায় খেজুর, পর্যাপ্ত ফাইবার থাকায় কোষ্ঠকাঠিণ্যে বেদনা কমে, তা ছাড়া উচ্চরক্তচাপ, হৃদযন্ত্র, রক্তাল্পতা নিয়ন্ত্রণে রাখে, বদহজমেও খেজুর, কাবুলিওয়ালার ভাষ্যে। খেজুর থেকে বহু পদ, কাজু-খেজুরের যুগলবন্দীতে যেমন খেজুর-বরফি। ব্লাড-সুগারে খেজুর নয়, লোহা থাকায় সদ্য-মা খেজুর খেতেই পারেন।

খেজুর ছেড়ে খেজুর রসেই ফিরে আসি। খেজুর রসের তাড়ি, অপূর্ব। তাড়ি দেশজ পানীয়, এতে মৃদু নেশা। সকালে টাটকা খেজুর রস রেখে দিলে সন্ধেয় তাড়ি। তাড়ি তৈরি এমন কিছু কঠিন নয়, আট দশ ঘন্টায় খেজুর রস গেঁজে যায়, কোহল সন্ধানে। কোহল (অর্থাৎ ইথাইল অ্যালকোহল) সন্ধানে ইস্ট-এর উপস্থিতি চাই, ইস্ট একরকম উপকারী ছত্রাক, এককোষী ছত্রাক, যা খুব দ্রুত বংশে বাড়ে, যার জন্যে খেজুর রসের মধ্যে থাকা গ্লুকোজের আংশিক জারণ, তার থেকেই ইথালি অ্যালকোহল, তাড়ি প্রস্তুত। তাড়ি খেতেও বেশ, খেজুর রসের স্বাদ, মধ্যে হালকা অ্যালকোহল। তাড়ি মাথা পেট ঠান্ডা রাখে, গাঁয়ে ঘরের মনিষরা তাই বলে। তবে বেশি তাড়ি খেলে এই গাঁয়ের লোকই তাকে বানিয়ে দেয়— তাড়িখোর।

খেজুর গাছ বা তার রস বিষয়ে এপার বাংলার থেকে বেশি সচেতন ওপার বাংলার ছড়াকার-রা, তাঁদের ছড়ায়— 'ঘরে ঘরে বলছে সবাই/কাঁথা কম্বল কই/রসের খোঁজে লোক উঠেছে। খেজুর গাছে ঐ' (ইকবাল কবীর মোহন); 'খেজুর রসের গুড়ে পিঠা ভোজ ধুম/সাথে খায় লাড় মোয়া টাটকা হুড়ুম' (দালীদ শাহাদাত হোসেন); 'খেজুর গাছে মাটির হাঁড়ি/ভরছে খেজুর রসে/মায়ের হাতে খাই যে পিঠা/উনুনেতে বসে' (ফরিদ আহমেদ হৃদয়); 'শীত এলে নজর কাড়ে/খেজুর গাছে হাঁড়ি/মৌ মৌ গন্ধে বিভোর/গাঁয়ের বাড়ি বাড়ি' (হোসাইন মোস্তাফা)। তবে কবি সুকান্তের কবিতায় খেজুর রস সংগ্রহে খেজুর গাছ কাটায় বেদনা-বোধের প্রকাশ—

'পাশেই খেজুর গাছ
সতেরোটি শীতাতঙ্কের
সতেরটি অস্ত্রোপচারের
ক্ষত-চিহ্ন ইতিহাস

কালো কালো দীর্ঘশ্বাস
বুকে-পিঠে নিয়ে নিরালে ঝিমায়
তার দিকে কে তাকায়?'

খেজুর রসে খেজুর গুড়, সম্পূর্ণ দেশজ। দেশজ হলেও খেজুর গুড়ের ভেজাল, মায়াপুরে না কোথায় যেন দেখেছিল যাদব, ভক্ত যাদব আমার প্রতিবেশী। বিস্কুটের গুঁড়ো বা আলু সেদ্ধ করে মাখা, তার সঙ্গে জল মেশানো ফুটন্ত গুড়, ওজনে-আয়তনে বাড়িয়ে ভাঁড়ে ভাঁড়ে, গরম গরম দানা ওঠা গুড় কিনে নিয়ে বাড়ি ফেরে ভক্ত-শিষ্যের দল, দূর-দূরান্তে, যারা বেড়াতে আসে। গুড়েও ভেজাল, ভেজাল সর্বত্রই, শুধু চিনে নিতে হয়।

অক্ষয়বটের দেশ

না-লেখকদের কথা

কালীকৃষ্ণ গুহ

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় নিজেকে 'না-লেখক' বলতেন। না-লেখকের কোনো সংজ্ঞা তিনি দিয়েছিলেন কি না মনে পড়ে না। না-দিলেও আমরা কিছুটা অনুমানে বুঝে নিয়েছি। লেখক হিসেবে যাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা ঘটেনি— বন্ধুসমাজের বাইরে যে প্রতিষ্ঠা— যাদের প্রকাশক নেই এবং, সেই কারণে যথেষ্ট পাঠক নেই, খ্যাতি নেই, যারা নিজের পয়সায় বই ছাপিয়ে বিলি করে এবং পোকার খাদ্য জোগান দেয়, যাদের কিছু গোপন অহংকার আছে যা তাদের বাঁচিয়ে রাখে আর লিখনকর্মে নিয়োজিত করে— যারা লিখে-কিছু-লাভ-নেই জেনেও বহু দ্বিধা ও আলস্য কাটিয়ে উঠে শেষপর্যন্ত লেখে এবং কেন লিখছে তার দর্শন তৈরি করে, যারা সভায় বসে খ্যাতিমান লেখকদের ভাষণ শোনে অনিচ্ছা সত্ত্বেও— যারা কোনো পুরস্কার না পেয়ে স্বস্তিতে থাকে যদিও পুরস্কার পেয়ে যাবার ভয় যাদের ছেড়ে যায় না— তারাই হয়তো সন্দীপনকথিত 'না-লেখক'। 'আধুনিকতা'র শিরোমণি লেখক সন্দীপন কোনো সরল মানুষ ছিলেন না, তাঁর লেখাও সরল ছিল না। তাঁর প্রতিটি বাক্যই পড়তে হত মনঃসংযোগ করে। অনেকে বলেছেন, তিনি ভাষা লিখতেন, বাক্যগঠন করতেন শুধু। আমরা তাঁর অনুগামী মুষ্টিমেয় পাঠক অবাক হয়ে তাঁর 'ভাষা' পড়তাম, তাঁর গঠিত বাক্যগুলির দিকে তাকিয়ে থাকতাম। তর্ক করতাম। একবার তাঁকে বলেছিলাম, 'বুদ্ধি যত বড়োই হোক, জানবেন, সন্দীপনদা, তা সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে বা যে-কোনো শিল্পসৃষ্টির জন্য ক্ষুদ্রবুদ্ধি।' বলেছিলাম, যেহেতু মনে হত তিনি তাঁর বুদ্ধির উপর বেশি নির্ভরশীল ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'তোমার কথাটা শুনে মনে হচ্ছে চেয়ার থেকে নেমে মেঝেয় বসি।' এ ছিল তাঁর ভর্ৎসনা! তাঁর সহৃদয় ভর্ৎসনা গ্রহণ করেও নিজের কথাটা টেনে নিয়ে বলেছি, 'চাই জীবনানন্দকথিত অনুভূতিদেশের আলো, যা আসলে একধরনের বেদনাবোধ, যা বুদ্ধির অধিক।'

এক যুগ হল সন্দীপন চলে গেছেন। তাঁর গলায় ক্যান্সার হয়েছিল বলে এক বছর বাড়ি থেকে বেরোননি, কাউকে বাড়িতে ঢুকতেও দেননি। একবছর পর ঘরের দরজায় 'আমি ভালো আছি'-লেখা একটা পোস্টার টাঙিয়ে রাখতেন যাতে কেউ কোনো প্রশ্ন না করে তাঁর অসুস্থতা নিয়ে। একবছর পর তিনি বাড়ি থেকে বেরোতে শুরু করেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষবারের জন্য শ্বাসগ্রহণ করেন।

কেন আজ সন্দীপনের কথা এল এ প্রশ্ন উঠতেই পারে। সন্দীপনের লেখালিখি নিয়ে, চিন্তাভাবনা নিয়ে, অবশ্যই অতি দীর্ঘ একটি প্রবন্ধ লেখা যায়, যে কাজ করার জন্য অনেক সময় ও মনঃসংযোগ দরকার। এই মুহূর্তে আমরা সেই কাজের ভার অনিশ্চিত ভবিষ্যতের উপর সমর্পণ করে রাখছি। জানি না সে-সময় আর হবে কি না। আজ তাঁর 'না-লেখক'-এর সূত্র ধরে কয়েকজন লেখককে (বা 'না-লেখককে') নিয়ে কিছু কথা বলার চেষ্টা করব। তাঁর সমসাময়িক আর এক 'না-লেখক' কার্তিক লাহিড়ীকে নিয়েও কিছু কথা বলার থাকবে আমাদের। এসবই ভবিষ্যতের কাজের প্রস্তাবনা। জানি, সময়ের কোনো অস্তিত্ব নেই। তবু আয়ু দিয়ে তাকে মাপতে হয় আমাদের। সেখানেই আমাদের অন্তিম ব্যর্থতা।

২

কিছুকাল আগে তপনকর ভট্টাচার্যের 'হাবা' নামের একটা উপন্যাস হাতে এল। এটি কোনো মহৎ উপন্যাস কি না, সে বিষয়ে মন্তব্য করার সময় এখনও আসেনি। কিন্তু এটুকু বলতে আমাদের বাধা নেই যে বইটিতে রয়েছে লেখকের মৌলিক ভাবনার পরিসর, নিজস্ব ভাষাগঠনের পরিসর, বাস্তব-অবাস্তবের মিশ্রণ যা এমন সাংকেতিকতা আনে যার একটা সুদূরতা আছে। বইটি বর্তমান নিবন্ধকারকে যে এতটা চমৎকৃত করল তার কারণ হয়তো এই, যে, সাম্প্রতিককালের বাংলা কথাসাহিত্য বিষয়ে বর্তমান নিবন্ধকরের পড়াশোনা অত্যন্ত সীমিত।

ভোম্বল আর হাবু দুই বাল্যবন্ধু, সহপাঠী, প্রতিবেশী। ভোম্বল ভালো। হাবু খারাপ। ভোম্বল ভালো এইজন্য যে সে

জীবনে সবসময় প্রথম স্থান নিয়েছে পড়াশোনায়। খেলাধুলোতেও তার স্থান সকলের উপরে ছিল। সারা কলোনি জুড়ে ভোম্বলের প্রশংসা আর হাবুর প্রতি বিদ্রূপ। হাবু তার নামটাও হারিয়ে 'হাবা' নামে পরিচিত। ভোম্বল একদিন প্রকাশ্যে হাবুর কান টেনে তার মাথা আনতে পারল না। উপন্যাসের শুরুর বাক্যটি, 'কান টানলেও মাথা এল না।' দর্শক-জনতার মধ্যে এতে দারুণ অস্বস্তি। তারা প্রশ্ন তুলল, 'মাথা আসে না কেন?' অবিশ্বাসী চোখে জনতা দেখল, 'ভোম্বলের হাতে হাবুর কান অথচ পাশেই হাবু— সোজা, ঋজু, সিধে— না হলে, টাল না খেয়ে ব্যথায় অবিচল, হাসি হাসি চোখে আমোদের ঝটকা। নির্বিকার হাবু, বোঝাই যায় না ভোম্বলের হাতে তার কান।' হাবু নিজের বাড়িতেও পরিত্যক্ত। সে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে, ঘুড়ির পিছনে দৌড়োয়, তার মুখে একটিই বুলি, 'ভোকাট্টা'। সে নিমন্ত্রণ না পেলেও উৎসব-বাড়িতে গিয়ে আসন করে নেয়। পেট ভরে খাওয়ার পরেও দ্বিতীয় আইসক্রিম হাতে নিয়ে আসন ছাড়ে। এর পাশে সারা কলোনি জুড়ে একটা বাক্য বারবার উচ্চারিত হয়: 'আমাগো ভোম্বলের তুলনা নাই।' পাড়ার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের প্রতিনিধি কিংকরদা সর্বদা ভোম্বলকে পাহারা দেন। যাতে সে সকলের আদর্শ হয়ে থাকে। হাবু অসুখ-বিসুখে বুদ্ধিভ্রষ্ট। তাই 'পাগল-ছাগল'।

কিন্তু ভোম্বল এদিকে হাবুর কাছে হেরে বসে আছে। 'ভোম্বল হাবুর পোঁদে লাথি মারল। জুতোর স্পষ্ট ছাপ হাবুর পিছনে। হাবু হেসে বলল, থ্যাংক ইউ।' হাবুর কখনো রাগ হয় না? ভোম্বল হাবুর কাছে হেরে গিয়ে হাবু হতে চাইল। সে ঠিক করল, বিরাট চাকরিটা ছেড়ে দেবে, সে হাবুর মতো স্বাধীন হবে, সমস্ত রাস্তাঘাট অধিকার করবে। সে অফিসে যাওয়া বন্ধ করে। সে ভালো পোশাক পরা বন্ধ করে, স্নান করা বন্ধ করে, চুল আঁচড়ানো বন্ধ করে। সমস্ত কলোনিতে হা-হতাশ শুরু হয়। সে বলে, 'আমি হাবুকে ভালোবাসি হাবু হতে ভালোবাসি। হাবু মানে হাবা। হাবা মানে গাবা। হাবাগাবারা অচল।... হাবু জাল নোট। চালানো যায় না। ব্যবসাও হয় না।' সমস্ত কলোনিতে হাহাকার ওঠে। সেই হাহাকার শুরু হয় এই বাক্যটি থেকে— যা একটা স্থানীয় প্রবচনের রূপ পেয়েছে, 'কি বিয়া করলি রে মদন—'। নিশ্চয় কোনো কালে কোনো এক মদন বিয়ে করে যে বউ এনেছিল সে তার শাশুড়িকে শান্তি দেয়নি! সেই নিহিত ইতিহাসখণ্ডই এই বাক্যে উচ্চারিত। লেখকের ভাষায় একটি অনুচ্ছেদ পড়ে নেয়া যাক:

কি বিয়া করলিরে মদন—

> জনগণ গমগম স্বরে আকুল হয় না। ক্ষীণ, কান পেতে শুনতে হয়। সমবেত আকুলতা নেই। ব্যক্তিগত ক্ষোভ, ব্যক্তিগত অভিমান, তাও গোপনে। ফিসফাস, কথা চালাচালি, রাগ, ঘৃণা, প্রতিবাদ সব আলমারিতে তালাবন্ধ। অথবা ব্যাঙ্কের লকারে, ন মাসে ছ মাসে বের করে, সুযোগ বুঝে। তবু বিলাপ থেকে যায়। হাওয়ায় ভাসে। যার কান আছে, শুনতে পায়।

যে ভোম্বল এত প্রশংসিত সে জানে যে সে তত মহৎ মানুষ নয়। সে পাড়ার সুন্দরী মেয়ে টাপটুপকে 'রেপ' করেছিল যার পরিণতিতে টাপটুপের স্থান হয় বিভিন্ন নিষিদ্ধ পল্লিতে। কিংকরদা এই ঘটনা জেনেও ভোম্বলের বিরুদ্ধে কখনো কিছু বলে না, কারণ ভোম্বল সমস্ত পরীক্ষায় প্রথম স্থান পেয়ে এসেছে এবং শেষ পর্যন্ত একজন বিরাট চাকুরে— অর্থাৎ সেই অঞ্চলের 'আদর্শ'। সে একদিন কিংকরদাকে বলে, 'আপনি আমাকে শেষ করে দিয়েছেন। আপনাকে আমি সহ্য করতে পারি না। আপনার ভয়ে আমি মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। সিগারেট খাইনি। তাস খেলিনি। লাইনে দাঁড়িয়ে সিনেমা দেখিনি।'

এই উপন্যাসের আরেক চরিত্র কেলেবিলে। যে ছোটো গুন্ডা হিসেবে খুন হয়ে যায় কিন্তু আবার বড়ো গুন্ডা হিসেবে বেঁচে ওঠে ফরসা চেহারা নিয়ে যার হাতে অগণিত আংটি, যার অধীনে অজস্র ছোটো গুন্ডা, যার ব্যাবসা জলাজমি বুজিয়ে বাড়ি তোলা। সে শেষপর্যন্ত একজন বক্তা হয়ে ওঠে। অন্যের লিখিত বক্তৃতা সে মুখস্থ করে বক্তৃতা দেয়। একসময় ভোম্বল টাপটুপের ঘরে যায় আর তাকে পতিতালয় থেকে বিয়ে করে ফিরিয়ে আনে। আর হাবু দ্বিতীয় কেলেবিলের (যে এখন বিল্বদল, নির্বাচনে প্রার্থী) সাহায্যকারী হয়ে ওঠে।

ভোম্বল হাবু হবার চেষ্টা করার ফলে হাবু আবার 'ভালো' হয়ে যায়, সে বোধবুদ্ধি ফিরে পায়। এই উপন্যাসে হাবু আর ভোম্বল যেন একই ব্যক্তি দ্বৈতসত্তায় বিভাজিত। এ যেন একটা অস্তিত্ববাদী চিন্তকের লেখা, যা রূপক আশ্রয় করে উপন্যাসের শরীরে গড়ে ওঠে।

লেখক, তপনকর, সন্দীপনের সংজ্ঞার সূত্রে, একজন 'না-লেখক' যেহেতু তাঁর কোনো প্রকাশক নেই বন্ধুবৃত্তের বাইরে, পাঠক নেই, যাঁর লেখায় কোনো বিনোদনের জোগান নেই— যাঁর লেখা একটা সময় আর মানবসমাজকে ধরতে চায়, বুঝতে চায়, ব্যাখ্যা করতে চায়। তাঁর উপন্যাস হয়তো একটা অঘোষিত সাব-অলটার্ন স্টাডি।

৩

প্রসঙ্গত আমরা আরেকটি উপন্যাসের কথা বলতে চাইব। দীপ্ত দাশগুপ্তর *সেই দিনগুলো*। এটি খুবই সরল একটি আত্মজৈবনিক লেখা, যা একটানা পড়ে শেষ করে ফেলা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। একজন চিত্রশিল্পী স্কুলে শিল্পশিক্ষকের জীবিকার কীভাবে নাজেহাল হয়েছে অথচ কত ভালোবাসা পেয়েছে, তার অনবদ্য কাহিনি।

অনন্ত, কাহিনির নায়ক, শিল্পশিক্ষক। সে কীরকম চাকরি করে উপন্যাসের শুরুতেই সে-কথা উঠে আসে। এই শুরুও আকস্মিক। এই:

> হায়রে কপাল। তবে কি এই কাজটাও যাবে। কী আর করা যায়। তাই বলে তো সবকিছু মেনে নেওয়া যায় না। এমনতর ভাবতে ভাবতে ঘরে ফিরছিল অনন্ত। আপন মনে হাসে। কাজই বটে। না আছে পয়সা, না আছে সম্মান। স্থায়িত্ব নেই, দায়িত্ব আছে। নানা রকম চিন্তা করতে করতে গেটের বাইরে যেতেই একটি চায়ের দোকানে সুজয়বাবুকে দেখতে পায় অনন্ত।

শুরুর এই অনুচ্ছেদটি পড়েই বোঝা যায় দুর্ভাগ্যের কথা ভাবলেও নায়ক আনন্ত 'আপন মনে হাসে' এক জীবনরসিকের কথা শুরু হল, বোঝা যায়। অনন্ত সমস্ত দুঃখকষ্ট স্থিরভাবে গ্রহণ করে আর নানা ধরনের মানুষের পরিচয় গ্রহণ করতে করতে জীবন কাটায়। আমরা এখানে একটি পরিচ্ছেদের কিছু অংশ পড়ে নিয়ে অন্য কোনো প্রসঙ্গে যাব।

> পুরো কাজ তো যায়নি, বিভিন্ন রকম কাজ করে অবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা করে অনন্ত। কাজ ছেড়ে শহরে খালি হাতে ফিরলে তো চলবে না, অর্থনৈতিক সঙ্কট যাই থাক পেটের খিদে বেড়ে যায়। সারাদিন সাইকেল চালিয়ে উন্মুক্ত পরিবেশে ঘুরলে খিদে তো বাড়বেই। তবে খিদের মুখে খাবারও জুটে যায়। ইস্কুলেরই ইংরেজি শিক্ষিকা চন্দনাদির বাড়িতে তাঁর ছেলেকে আঁকা শেখাতে যায় অনন্ত। খুবই সম্মান করেন তিনি। তাঁর বাড়িতে পৌঁছালেই জোটে ভালো ভালো খাবার। পথে খিদে পেয়ে যায় সাইকেল চালিয়ে। খাবারের দোকান যে দু'চারটে নেই পথে তাও নয়। কিন্তু শিক্ষিকার বানানো গরম লুচি তরকারি বা উপাদেয় মিষ্টি ফেলে পথে অর্থব্যয় করার কোনো মানেই হয় না। ভালো ভালো খাবার পরিবেশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত বলে, 'আবার এত কিছুর কোনো দরকার আছে?'
>
> অনন্তের প্রশ্নের উত্তরে চন্দনাদি বলে, 'ইস্কুল থেকে সাইকেল চালিয়ে এতদূর আসেন, পরিশ্রম তো কম হয় না। না করবেন না। তাহলে খুবই দুঃখ পাব।'
>
> অনন্ত মোটেই দুঃখ দিতে চায় না। তবু একটু 'না' না-বললে লোকে কী ভাববে। টপটপ খাবারগুলি শেষ করে অনন্ত। আবার শিক্ষিকার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'আরো দুটো দিই, অনন্তদা।'
>
> 'দিন, আপনাকে আর দুঃখ দিয়ে লাভ কী', বলে অনন্ত।
>
> মনে মনে ভাবে দুঃখ পেলে কি আর খিদের মুখে এমন খাবার জুটবে।
>
> 'থাক থাক, আর লাগবে না' বলেই আরও বেশ কয়েকটা লুচি আত্মসাৎ করে সে। তারপর টিউশন সেরে উঁচুনীচু রাস্তা দিয়ে ঘরে ফিরতে বেশ খানিকক্ষণ লেগে যায় আনন্তর। 'পার্টটাইম টিচার' করে দেওয়ায় ইস্কুলে সপ্তাহে তিনদিন গেলেই হয়। নিজের ড্রয়িং, আউটডোর, বিভিন্ন সংস্থার কাজ, পড়াশুনা ও নানা মানুষের সঙ্গে ওঠা বসা করতে করতেই সময় যায় অনন্তের, মণি রান্না করে সকালেই। কম পয়সায় মণির পক্ষে সংসার চালানো কষ্টকর হয়ে যায়। তবে ইস্কুলের বাইরে কাজ করে খানিকটা উপার্জন করে অনন্ত। তাই অবস্থা কিছুটা সামলানো যায়। দু'মুঠো ভাত খেয়ে ইস্কুলে চলে যায়। সব কাজ সেরে সন্ধ্যায় ফেরে, মণি সংসারের কাজ সেরে অধীরভাবে বসে তাকে অনন্তের অপেক্ষায়। অনন্তের কাছে দিন যতই ছোটো হোক, ঘরে মণির কাছে দিন অনেক বড়ো। অপেক্ষায় সময় কাটে না। শহরে আত্মীয়স্বজন থাকায় ও বিভিন্ন সাংসারিক কারণে মণি যখন কিছুদিনের জন্য শহরে যায় তখন অনন্ত আরও সকালে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।
>
> খুরশেদের দোকানের পাশে সিঙ্গারা, কচুরি খেয়ে পাঁচ কিলোমিটার সাইকেল চালিয়ে ছুটে যায় ইস্কুলের দিকে। যাওয়ার পথে ডেকে নেয় নবকান্তকে। তারপর দুটি সাইকেল এক ছন্দে চলতে থাকে। লেভেল ক্রসিঙের পাশে চায়ের দোকানে একটু জিরিয়ে নেয়। বাঁশঝাড়ের মাঝে লালমাটির রাস্তায় গড়িয়ে যায় সাইকেলের চাকা। থামে গিয়ে ইস্কুলের গেটে। অর্থনৈতিক অবস্থা যেমনই থাক, অনন্তের খাওয়া চিরকালই রাজসিক, ঘরে বসে ঝিঙের ঝোলই হোক বা পাঞ্জাব হোটেলে রুটি মাংসই হোক। খিদের মুখে সকলই অমৃত। অনন্ত জানে, খিদের মুখে খাবার না জুটলে মানুষের খিদে নষ্ট হয়ে যায়। তখন খেতে দিলেও মানুষ খেতে পারে না। সে বড়ো কঠিন অবস্থা। নিজের কাজটুকু জানার গুণে পেটের খিদে ও মনের খিদে সময়মতো মেটাতে পারে অনন্ত। তবে কীভাবে মেটে সে নিজেও জানে না। সাইকেল চালিয়েই মফসসল শহরে অনন্তের অনিশ্চিত দিন কাটে। একসময় ঘোরতর অনিশ্চয়তার মধ্যে সে ফিরে আসে শহরে।

উপন্যাসটি শেষ হয় এই উপলব্ধিতে এসে, 'অনন্ত জানে সাইকেলের চাকার মতো গতিই জীবন। চাকা চালালেই কাজ, চিন্তা করলে চাকা থেমে যায়। চাকা চললে চিন্তা কাছে ঘেঁসে না।'

এখানে বলে রাখা যায় যে লেখক দীপ্ত দাশগুপ্ত কবি অমিতাভ দাশগুপ্তের পুত্র। ছবি আঁকাই তাঁর জীবিকা। কোনো তাত্ত্বিকতা নয়, যাপিত জীবনই তাঁর এই উপন্যাসের বিষয়। বস্তুত এত অমলিন লেখা খুব বেশি পড়া হয়ে ওঠে না আজকাল। এই উপন্যাসে বহু মানুষের সমাবেশ। অধিকাংশই সহজ সাধারণ মানুষ। অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষী, অসৎ, লোভী মানুষও তাদের মধ্যে রয়েছে— যেন মানবসমাজের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত একটা সমগ্রতা অর্জন করে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়। ভঙ্গুর এই সমগ্রতা বা, বলা যায়, চলমান এক সমগ্রতা। লেখকের অঙ্কনে—চিত্ররেখার ডোরে— বইটি সমৃদ্ধ হয়েছে।

৪

উপন্যাসের কি কোনো সংজ্ঞা দেয়া সম্ভব? এ বিষয়ে দেবেশ রায় অনেক লিখেছেন। একটি বাস্তব ঘটনার বিবরণ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও উপন্যাস হয়ে উঠতে পারে। সম্প্রতি পড়া স্বাতী গুহর অসাধারণ উপন্যাস 'সমুদ্র' পড়ে অবাক হয়ে দেখেছিলাম, সেখানে দুটি চরিত্রের কথোপকথনের বাইরে একটিও বাক্য নেই। অথচ সেই কথোপথনে সমস্ত পরিবেশ, সব দুঃখবেদনা, সব বাস্তবতা রূপ পেয়েছে। ভিন্ন চরিত্রের একটি নারী এবং একজন পুরুষ ঘটনাচক্রে একই ফ্ল্যাটে বাস করে। তাদের মধ্যে কীরকম সম্পর্ক তা নিয়ে সমস্ত কথাবার্তা। এখানে আমরা ওই উপন্যাসটির প্রথম পৃষ্ঠাটি পড়ে নিতে পারি:

যে দিন কলেজ থাকে না, মানের ছুটির দিন কী করো?

তেমন কিছু না।

ঠিক বুঝলাম না। কী করো? কলেজের দিনগুলো তো দৌড়ে চলে যায়।

না, ঠিক তেমন নয়

তবে কেমন? সেটাই তো জানতে চাইছি। অবশ্য যদি তোমার আমাকে বলতে আপত্তি থাকে তো থাক, বলতে হবে না।

না, না, সে সব কিছু না। আসলে...

আসলে আমার সঙ্গে কথা বলতেই তোমার ভালো লাগে না।

আরে না না...

আসলে তোমার কথা বলতেই ভালো লাগে না...

সেটা হয়তো কিছুটা ঠিক।

কিছুটা কেন? পুরোটাই ঠিক।

না, পুরোটা ঠিক নয়। আসলে... আসলে আমার নিজের সঙ্গে ছাড়া কারও সঙ্গে কথা বলার অভ্যেসটা হারিয়ে গেছে।

আমি জানি।

তুমি জানো না।

এই যে তুমি মনে করো আমি কিছু জানি না, এটা আমার দারুণ লাগে। আর তাই আমি আরও একটু সময় পেয়ে যাই তোমাক জানার।

আমি কে? আর কেনই বা তোমার আমাকে জানার ইচ্ছে সে সব আমি বুঝি না।

আমি আর কেউ না হলেও গত দেড় বছর ধরে তোমার হাউস পার্টনার। এটা তো মানো? নাকি আমাকে তোমার সমগোত্রীয় মানুষ বলেই মনে হয় না?

যাঃ, তা কেন হবে?

আসলে এই দেড় বছরের মধ্যে তুমি হয়তো এই ফ্ল্যাটে খুব বেশি হলে দেড় মাস থেকেছ। আর সত্যি বলতে কী তোমার কাজকর্ম, গতিবিধি, রহন-সহন, অন্তত আমি যতটা বুঝেছি তা আমার থেকে বা বলা যায় আমার কল্পনার থেকেও এত দূরের যে আমি তেমন কোনো উৎসাহ বোধ করিনি।

এই একশো ষাট পৃষ্ঠার উপন্যাসটির শেষপর্যন্ত চোখের জলের সমুদ্রে গিয়ে মেশে। এখানে আমরা শেষ পৃষ্ঠাটিও পড়ে নিতে পারি:

আমাকে যেতে হবে।

কোথায়?

সোয়াস।

কতদিনের জন্য?

জানি না।

সেই জন্যই সহজে রাজি হলে?

না। তোমার ফ্ল্যাট, অ্যাজ অ্যা নেইবার আমারও তো কিছু দায়িত্ব আছে।

এতটা কঠিন হয়ো না। মানায় না তোমাকে।

আমাকে যে কী মানায়, তা তো বুঝেই উঠতে পারলাম না।

আমি জানি।

কীভাবে জানলে?

ধ্যানে।

কী পেলে?

একটা গোটা সমুদ্র।

বড্ড নোনতা।

আমার চোখের জলের মতো।

সম্প্রতি পড়া আরো একটি উপন্যাসের কথা মনে পড়ছে। স্বপন চক্রবর্তীর *অবসানচিত্রের উন্মাদ খসড়া*। স্বপনকে পাঠক সমাজের ক'জন চেনে জানি না। কিন্তু তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা খুব কম নয়। এই উপন্যাসটি একটি চিঠির সংকলন। লেখক তাঁর বন্ধুদের চিঠি লিখেছেন। কাকে কোন চিঠি তার কোনো উল্লেখ নেই। ফলে এটি দাঁড়িয়ে গেছে একটি অতি দীর্ঘ স্বগতকথন হিসেবে। নিঃসন্দেহে উপন্যাসের একটি নতুন কাঠামো এল আমাদের হাতে। তাঁর একটি চিঠির একটি অংশ পড়া যাক:

এক এক করে মুছে দিই— প্রকৃতিকে।
হ্যাঁ, প্রকৃতির চেয়ে আমি— এই আমি— কম কিছু না কি!
অতএব, সমান্তরাল পথে আমিও ছবি আঁকি, গান গাই, পথ হাঁটি...

চৈত্রের ভ্রূকুটি বলছে: সাবধান!
তা বলেই কি আমি থমকে যাবো?

এইরকম নিজেকে বলা কথা সব। নিজের কথা বলে যাওয়া। এ যেন কবিতার সমান্তরালে চলে তাঁর বাক্যধারা।

তিনি লেখেন,

সব কোথায় যেন চলে যায়!
অঘান মাস আসে, অগ্রহায়ণ চলে যায়।
পাখি-পতঙ্গ ওড়ে, পরিযায়ীরা যথাকালে উড়ে আসে আকাশ পার হয়ে আবার উড়ে চলে যায়।
গাছে-গাছে পাখিরা গান গায়। নতুন পাখি— পুরাতন গান।
পুরাতন পাখি— নতুন গান।
পুরাতন পাখি— পুরাতন গান।
নতুন পাখি, নতুন গান।

জীবনের প্রত্যুষ, জীবনের অবসান।

এই বইটি পড়া মানে দিনের পর দিন মানবসমাজ ও বিশ্বপ্রকৃতির দিকে তাকিয়ে থাকা। আশ্চর্য হবার মতো কোনো ঘটনা নেই। অথচ আশ্চর্য হয়েই তাকিয়ে দেখতে হয় স্বাভাবিক চলমান জীবনধারা। এ সেইরকম বই যা পড়া শেষ হয় না। এর কোনো শুরু নেই, শেষ নেই।

৫

এই লেখা শেষ করার আগে একটু প্রসাঙ্গন্তরে যেতে হবে। আমাদের অনুজ বন্ধু— কবি, অনুবাদক, সারাক্ষণের সাহিত্যপাঠক, ইংরাজিসাহিত্যের অধ্যাপক— শুভেন্দুবিকাশ অধিকারী অকস্মাৎ অকালে বিদায় নিলেন। বন্ধুবৃত্তের বাইরে তাঁরও বিশেষ পরিচয় ঘটে ওঠেনি। পরিচিত পাবার জন্য তাঁর মধ্যে কোনো আগ্রহ বা ব্যস্ততা লক্ষ করিনি। নিজের কবিতা নিয়ে তিনি ছিলেন কিছুটা নিরাসক্ত। কিন্তু অন্য ভাষার— ভারতের বা বিশ্বের— কবিতা অনুবাদ করে বাঙালি পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করার ব্যাপারে তাঁর কোনো ক্লান্তি ছিল না। এখানে আমরা তাঁর 'বাবা' কবিতাটি পড়ব:

কাঁপা-কাঁপা
হাতে
বাবা একটা কমলালেবু ধরে আছেন
যেন খুব ভারী
খুব ভারী
একটা পৃথিবী

চিঠির বাক্স

অষ্টমবর্ষ প্রথম সংখ্যা (১-১৫) সংখ্যাটি সর্বার্থে সুসম্পাদিত বিষয়গুণে। প্রথমেই লিখি বরাবরের মতো সম্পাদকীয়, সমসাময়িক নিবন্ধগুলি এক একটি তূণীর। মগজাস্ত্রে শান দেওয়ার মতো ধারালো। সাহিত্য করে বলা যেতে পারে 'তীব্র কুঠার'। 'এক মেষ-নাগরিকের আত্মবীক্ষা' অনুরাধা রায়ের প্রবন্ধটি সুলিখিত। এই সংখ্যার সেরা লেখা হল, ভারতের তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের পঞ্চাশ বছর। লেখক দীপাঞ্জন গুহ। একদা অটোমেশনের বিরুদ্ধে বাংলা তোলপাড় হয়েছিল বটে, কিন্তু এখন কম্পিউটার ছাড়া এক পা-ও চলতে পারা যায় না। কিন্তু বস্তুটি কোথা থেকে এল, কীভাবে এল তার ইতিহাস ও বিস্তার আমাদের মতো সত্তুরে বৃদ্ধদের জলের মতো বুঝিয়ে দিয়েছেন, এর জন্য লেখককে ধন্যবাদ।

উপাসক কর্মকার
কলকাতা

২

১-১৫ জানুয়ারি ২০২০-র সংখ্যাটি বেশ কিছুদিন হল হাতে পেয়েছি। শিল্পী মনোজ-দত্ত কৃত প্রচ্ছদচিত্রটির দিকে কখনো-কখনো অপার বিস্ময়ে তাকিয়ে থেকেছি। অজান্তে দিন কেটে গেছে। বারবার এক ভাবনা আমাকে এক অনিবার্য প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়েছে। কী বলতে চাইছে, এই আশ্চর্য কালোকালির ছবিটি? যে-নবীনা পুরোনো খাটের ওপর, সাদা ফুল তোলা বালিশে, মাথা রেখে শুয়ে আছে, কোন সুদূরের প্রতি তার দৃষ্টি অপলক। জানি, এর কোনো সুষ্ঠু উত্তর নেই। তবু এক অব্যক্তের ভার লাঘব করবার জন্য, কিছু বলতেই হয়। যেমন জমাট কালোকালি খাটের পিছনের শূন্যতাকে ভরাট করেছে। যেন শীতরাত্রির নিশীথ-প্রেক্ষাপট। আর ওই প্রেক্ষাপটে দেখতে পাই, টিভি-র পরদায় ভেসে উঠেছে, দুটি অদ্ভুতদর্শন প্রাণী। শায়িত নবীনার দিকে যাদের ইঙ্গিতবাহী চোখ। খাটের নীচের আনুপাতিক ভূমির ছোটো ছোটো বর্গক্ষেত্রে ছিটানো হয়েছে, জমাট কালোকালির বিন্দু। পাশের কিয়দংশ কালোকালির জমিতে রয়েছে, সাদা তেপায়া টেবিলের ওপর খালি ডিশ, পেয়ালা। গ্লাসে সম্ভবত কিছুটা পানীয় জল এবং পড়ে আছে, একটি খালি চামচ। টেবিলের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে, শীর্ণ ফুলদানি। ভিতরের মানিপ্লান্ট ঊর্ধ্বমুখী। আরো একটি কথা উল্লেখ করতেই হয়, উক্ত নবীনার শরীর আবৃত রয়েছে বেশ কিছু গাঢ় কালো পশমিনা ফুল-তোলা আচ্ছাদনে। পরিশেষে বলতে হয়, শিল্পী তাঁর নিপুণ শৈলী এবং সংবেদনশীলতায় যে স্থিরচিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, তার রহস্য এবং বিস্ময় অশেষ। টের পাই, অপরিসীম নীরবতায় মনের গোপন ঘরে, জ্বলে উঠেছে, এক সকরুণ আলো।

অশোক দত্তচৌধুরী
বরানগর

পুনঃপাঠ

ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ

মৃণাল সেন

এ-দেশের যে শহরটা, শুনে থাকি, বারুদে ঠাসা— তার নাম কলকাতা। কলকাতায় মিছিল, আওয়াজ, প্রতিবাদ। কলকাতায় বিক্ষোভ, ক্রোধ, ব্যারিকেড আর বোমা। কলকাতা বেপরোয়া, কলকাতা মারমুখী।

আমি কলকাতার মানুষ। আমি কলকাতার মিছিলে শামিল হয়েছি বারবার। মিছিলে আওয়াজ তুলেছি। হাজার লক্ষ গলার সঙ্গে গলা মিলিয়েছি। প্রতিবাদ করেছি। লড়াকু কলকাতার আগুনে আমিও উত্তপ্ত হয়েছি। উনিশশো উনপঞ্চাশের কলকাতার কথা মনে পড়ছে। প্রেসিডেন্সি, আলিপুর আর দমদম সেন্ট্রাল জেল গিজগিজ করছে প্রতিবাদী মানুষের ভিড়ে। বেহিসেবি গুলি আর লাঠি চলছে ভেতরে, বাইরে। এলোপাথাড়ি গুলি, বেপরোয়া লাঠি। আর ওই অসহ্য পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে এগিয়ে আসছে কলকাতার মানুষ, গ্রামের কৃষক, শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক। এগিয়ে আসছে মেয়ে, পুরুষ, ছেলে, বুড়ো—সবাই। প্রতিবাদ, প্রতিরোধ আর সন্ত্রাসের সংঘর্ষ। কাকদ্বীপের কৃষক রমণী অহল্যাকে খুন করা হয়েছিল সেই সময়েই। আর সেই সঙ্গে অহল্যার পেটের বাচ্চাটাকেও।

আমার কয়েকজন বন্ধু ও আমি তখন ছবির রাজ্যে ঢোকবার আপ্রাণ চেষ্টা করছি।

দেশে-বিদেশে ছবি নিয়ে যে প্রচণ্ড তোলপাড় চলছে তার খবর সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছি। কেমন করে এ-দেশের ছবিকেও সংগ্রামের কাজে লাগানো যায় সে কথা ভাবছি। গল্প পড়ছি। নিজেরাও লিখছি, লেখাচ্ছি, বাতিল করছি, বেছে নিচ্ছি এবং তাত্ত্বিক শুদ্ধতা মাথায় রেখে প্রয়োজনমতো মেরামত করে চলেছি। নানা উদ্ভট কল্পনায় সময়ে-অসময়ে তেতে উঠছি মুহুর্মুহু।

একদিন, উনিশশো উনপঞ্চাশ সালের কথাই বলছি খবর এল: ইচ্ছে করলে আমরা কাকদ্বীপে যেতে পারি। অর্থাৎ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে নানা বাধা ডিঙিয়ে কাকদ্বীপের 'লাল' এলাকায় আমাদের পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আমরা লাফিয়ে উঠলাম, উত্তেজনায় ধৈর্য হারাতে বসলাম, ছুটোছুটি করতে লাগলাম, যেমন তেমন একটা ষোলো মিলিমিটার মুভি ক্যামেরার খোঁজে আকাশ-পাতাল ওলটপালট করে ফেললাম।

ক্যামেরার ব্যবস্থা একটা হল। প্রাচীন এক ক্যামেরা, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে। কিন্তু চলে।

চিত্রনাট্য লেখা হল: জমির লড়াই। কাকদ্বীপ ও তেলেঙ্গানার লড়াইয়ের কথা মাথায় রেখে চিত্রনাট্য তৈরি হল, তাত্ত্বিক নেতা-উপনেতাদের সমর্থনও মোটামুটি পাওয়া গেল। সব ঠিক, যাব, ছবি করব, একটা নয়, অনেক।

যাওয়া অবশ্য হল না শেষ পর্যন্ত। অবস্থাটাও কেমন যেন অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছিল ক্রমশ।

এবং, একদিন, পুলিশের ভয়ে আর কোনও উপায় না থাকায় তাড়াহুড়ো করে চিত্রনাট্যটি পুড়িয়ে ফেলা হল।

তারও কিছুদিন পরে, একদিন, জানলাম, কমিনফর্ম বলেছে আন্দোলন বিচ্যুতির দিকে এগোচ্ছে। শুনে জেনে আশ্বস্ত হলাম, কাকদীপে যেতে না পারার আফশোসটা কিঞ্চিৎ কমল। কিন্তু চিত্রনাট্যটিকে পুড়িয়ে ফেলার যন্ত্রণাটা অবশ্য থেকেই গেল।

আরও দশ বছর পরের ঘটনা। উনিশশো উনষাট সাল। কলকাতা থেকে একশো মাইল দূরে বর্ধমানের অন্তর্গত মানকর গ্রামে ছবি তুলছি। ছবির নাম 'বাইশে শ্রাবণ'। কলাকুশলী কর্মী অভিনেতা অভিনেত্রী নিয়ে দলে আমরা সব মিলিয়ে প্রায় চল্লিশজন। মৃত্যুর মতো নিস্তব্ধ গ্রামটি কেমন যেন প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠল। গোটা গ্রাম যেন আমাদের ছবির সঙ্গে জড়িয়ে গেল, আমাদের আলাদা থাকতে দিল না। ভুলতে পারা যায় না এমন এক অভিজ্ঞতা।

একদিন খবর পেলাম, কলকাতা নাকি তোলপাড়। কাতারে কাতারে গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে কৃষকেরা এসেছে কলকাতায়,

মিছিলে শামিল হয়েছে তারা, লালদিঘির পাড়ে উদ্ধত রাইটার্স বিলিং-এর দিকে মিছিল এগিয়ে আসছে। আইন ভাঙতে নয়, আইনের পথেই আসছে তারা, দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পাওয়ার দাবি নিয়ে আসছে মিছিল।

মানকরে খবর এল, ওই মিছিলের ওপর পুলিশ গুলি চালিয়েছে, অতর্কিতে। শুনলাম, হতাহতের সংখ্যা মোটেই কম নয়। শুনলাম, কলকাতায় নরক জেগেছে।

আমরা শুটিং-এর জন্য তৈরি হচ্ছিলাম, খবরটা তখনই এল। আমরা, ছবির কর্মীরা, সমস্ত শুনলাম। গ্রামের লোকেরা সমস্ত শুনল। কলকাতা থেকে পরের ট্রেন কখন আসবে। ট্রেনযাত্রীদের কাছ থেকে কখন আমরা কলকাতার আরও খবর পাব তাই জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলাম।

সে দিন আমরা শুটিং করিনি। কাজ বন্ধ রেখে সে দিন আমরা সেই অমানুষিক উন্মত্ততার প্রতিবাদ জানালাম।

পরের দিন 'বাইশে শ্রাবণ'-এর যে দৃশ্য আমরা তুললাম তা হল তেতাল্লিশের মন্বন্তরের এক ভয়াবহ ছবি। কেমন করে মানুষেরই তৈরি মহামন্বন্তরে পিঁপড়ের মতো দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ পৃথিবীর চোখের সামনে তিল তিল করে মরে গেল সেই কথাই সে দিন আমরা বললাম আমাদের ছবিতে। সেই নারকীয় মারণ যজ্ঞের ভয়ংকর চাপে ব্যক্তি-মানুষ কেমন করে তার শেষ মানবিক অনুভূতিটুকুও হারিয়েফেলেছিল তাই আমরা আমাদের বুকের সমস্ত উত্তাপ আর ঘৃণা দিয়ে ছবিতে হাজির করলাম।

আরও দশ বছর পরে। উনিশশো উনসত্তর সাল। একটা রসঘন মিষ্টি ছবি তৈরি করেছি তখন 'ভূবন সোম'। ছবিটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠল, ওপরতলা নিচুতলা সমাজের সর্বস্তরেই ছবিটির কথা ছড়িয়ে পড়ল। অনেকেই, বহু দর্শক, সাধুবাদ জানালেন।

অসতর্ক মানুষ যাঁরা তাঁরা সে দিন তেমন বুঝতে পারেননি, আমিও বুঝিনি যে কলকাতার আকাশে আবার মেঘ জমছে, ঝড় আসছে।

বছর ঘুরতে না ঘুরতেই, সত্তর সালে, ঝড় এল। অনেক কিছুই ওলটপালট হয়ে গেল। সাময়িকভাবে, অল্প সময়ের জন্য, সাধারণ মানুষ কেমন যেন হকচকিয়ে গেল খানিকটা।

কিন্তু পরক্ষণেই প্রতিবাদ উঠল কলকাতার আনাচে-কানাচে। প্রতিরোধ মাথা তুলে দাঁড়াল।

প্রথমে ছিটিয়ে. ছড়িয়ে, তারপর একসঙ্গে কলকাতা আবার খেপে উঠল প্রচণ্ড বিক্রমে। কলকাতা ফেটে পড়ল প্রতিটি মহল্লায়, অলিতে-গলিতে, শহরের গোপন আস্তানায়। একদিকে ব্যারিকেড বোমা আর পাইপ গান, অন্যদিকে সন্ত্রাস আর সি-আর-পি-র কুম্বিং অপারেশন।

কলকাতার রাস্তায় তখন রক্ত ঝরছে। আর পার্ক স্ট্রিট—চৌরঙ্গির মোড়ে মহাত্মা গান্ধির স্ট্যাচুটাকে ঘিরে থাকছে বন্দুকধারী সেপাইয়ের দল।

শাসকের হাতে অবশ্যই জাদুদণ্ড নেই যে তাই ঘুরিয়ে রাতারাতি দেশের মানুষের মুশকিল আসান করবে। তাই অনাহারে মানুষ তখনও মরেই চলেছে, জিনিসপত্তরের দাম চড়ছে হু হু করে, গ্রামে-গঞ্জে জোতদারের অত্যাচার অব্যাহত, গরিবেরা নিঃস্ব হচ্ছে, অর্থবানেরা আরও ফাঁপছে।

অর্থাৎ, এস ওয়াজেদ আলির সেই পুরোনো কথা: সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে...।

উনপঞ্চাশ সালের কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল তাদের কথা যারা 'বিচ্যুতি' নিয়েও লড়েছিল কাকদ্বীপে, তেলেঙ্গানায়। মনে পড়ল আমাদেরই বন্ধু সলিল চৌধুরির সেই বিখ্যাত কবিতার কথা, 'শপথ', যে কবিতাটি উৎসর্গ করা হয়েছিল কৃষক রমণী অহল্যার উদ্দেশে। মন্ত্রের মতো আওড়াতে ইচ্ছে করল কবিতাটির সেই কয়েকটা কথা:

সে দিন রাত্রে সারা কাকদ্বীপে
হরতাল হয়েছিল।
সে দিন আকাশে জলভরা মেঘ
বৃষ্টির বেদনাকে
বুকে চেপে ধরে থমকে দাঁড়িয়ে ছিল।
এই পৃথিবীর আলো বাতাসের
অধিকার পেয়ে পায়নি যে শিশু
জন্মের ছাড়পত্র
তারই দাবি নিয়ে সারা কাকদ্বীপে
কোনও গাছে কোনও কুঁড়িরা ফোটেনি
কোনও অঙ্কুর মাথাও তোলেনি
প্রজাপতি যত আর একদিন
গুটিপোকা হয়েছিল
সে দিন রাত্রে সারা কাকদ্বীপে
হরতাল হয়েছিল।

হৃদয়ের সমস্ত অনুভূতি দিয়ে সলিল সে দিন হরতালের ছবি এঁকেছিল, পশুশক্তির বিরুদ্ধে দুর্জয় প্রতিবাদের ভাষা সে দিন মুখর হয়ে উঠেছিল সলিলের অস্তিত্বের প্রতিটি শিরা-উপশিরায়, কলমের ডগায়। সেই ভাষাকে সলিল দেখেছিল প্রচণ্ড বিক্ষোভে ছড়িয়ে পড়তে দেশের চতুর্দিকে—কারখানায়, খামারে, কলকাতার রাস্তায়। সলিলকে সে দিন আমরা বুকে করে নিয়েছিলাম।

লক্ষ মানুষের হয়ে সলিল সে দিন শপথ নিয়েছিল:

গ্রাম নগর
মাঠ পাহাড়
বন্দরে
তৈরি হও।
কার ঘরে
জ্বলেনি দীপ
চির আঁধার
তৈরি হও।
কার বাছার
জোটেনি দুধ
শুকনো মুখ
তৈরি হও।
ঘরে ঘরে
ডাক পাঠাই
তৈরি হও
জোট বাঁধো।

উনিশশো সত্তরের সেই ভয়ংকর দিনে আরও অনেক পুরোনো কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কথা, *দেশজ* 'ম্যাও'-এর কবি সুভাষ নয়, আনন্দবাজারের চিঠিপত্র বিভাগের পত্রলেখক ঠুনকো অনুযোগকারী সুভাষ নয়, *পদাতিক*-এর কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কথা মনে পড়ল। যে কথা আমাদের সকলের মুখে মুখে সে দিন ফিরেছিল সেই কথা:

প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য।

কথাটা পুরোনো, চল্লিশ দশকের শুরুর কথা। কিন্তু, মনে হল, যেন আজকের কথা, আজকের বিধান। মনে হল, ভেতর থেকে একটা বিশাল তাগিদ এল, একটা চাপ, এক ইস্পাতকঠিন নির্দেশ: ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য।

'ভুবন সোম' নয়। আসুক অন্য কিছু। সুভাষ মুখোপাধ্যায়েরই ভাষায় 'চলমান হাত' নিশপিশ করতে লাগল।

উনিশশো উনপঞ্চাশের 'জমির লড়াই' সম্ভব নয় এ-দেশের ছবিতে। নানা বাধা, ব্যবহারিক এবং আরও অনেক। যা সম্ভব— হয়তো তা আংশিক স্পষ্ট, বাকিটা ধোঁয়াটে কিংবা কল্পলোকের, স্বপ্নরাজ্যের, খানিকটা বিমূর্ত, ইচ্ছাপূরণের বা— হোক না তাই। দর্শক যেখানে আজকেরই মানুষ তাঁর কাছে সেই ধোঁয়াটে বিমূর্ত ছবিটাই কি রক্ত-মাংস নিয়ে এগিয়ে আসবে না? সমস্ত শারীরিকতা নিয়ে দর্শকমানসে তা কি ধরা দেবে না?

হয়তো কারও কাছে ধরা দেবে, কারও কাছে নয়। যাঁরা অর্থ খুঁজে পাবেন না এবং/অথবা যাঁরা আপাত অর্থহীন ছবিগুলিকেও রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'চৈতন্য' দিয়ে দেখতে নারাজ তাঁদের সংখ্যা হয়তো ভয়ংকর হয়ে দাঁড়াবে। তবু...।

উনিশশো উনসত্তরের দশ বছর পরে আসবে উনিশশো উনআশি। সেই সময়টা আসতে আরও কয়েক বছর বাকি। এই কয়েক বছরে সমাজজীবনে শিবিরে শিবিরে বিরুদ্ধতা আরও বাড়বে, আরও শানিত হবে, মধ্যবর্তীরা ধীরে ধীরে ইতিহাসের নিয়মে বিলুপ্তির পথে এগোবে, শিবিরে শিবিরে আঘাত-প্রত্যাঘাত তীক্ষ্ণতর হবে। তখন শত্রুকে চেনা যাবে আরও অনেক সহজে, বন্ধুকে পাওয়া যাবে হাতের নাগালের মধ্যে। শত্রু-মিত্রের ভাগাভাগিটা তখন আরও পরিষ্কার হবে কেননা মধ্যবর্তীদের ক্লীবত্ব-প্রাপ্তি তখন আরও পরিপূর্ণ চেহারা নিতে বাধ্য হবে।

এবং এই কথাটাই ইতিহাসের এক ভয়ংকর সময়ে, উনিশশো আটত্রিশ সালে, অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় চ্যাপলিন বলেছিলেন Modern Times ছবিটি তৈরি করবার কিছুদিন পরেই। চ্যাপলিন বলেছিলেন: এতদিন আমার 'চার্লি'কে পৃথিবীর সবাই ভালোবেসে এসেছেন। কিন্তু সময়ের দৌরাত্ম্যে 'চার্লি'-র চরিত্রে এখন বিবর্তন ঘটবে, বড়ো রকমের বিবর্তন। বুঝতে পারছি সবাই আর ওকে আগের মতো ভালোবাসবেন না।... এবং এই ভাগাভাগির জন্য আমি নিজেকে প্রস্তুত রাখছি।

উনিশশো উনআশিতে আরও স্পষ্টতর ভাগাভাগির জন্য আমাদের সবাইকে প্রস্তুত থাকতে হবে। সদর স্ট্রিটের বারান্দা থেকেই যে ''চৈতন্য'' দিয়ে দেখতে হবে এমন বিধান রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই দেননি।

মৃণাল সেন রচিত প্রবন্ধ *চলচ্চিত্র*— *ভূত বর্তমান ভবিষ্যৎ* বইটি থেকে এই প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হল। প্রকাশক: সপ্তর্ষি প্রকাশন (২০১৩)

LIFE BEGINS AT 60!

JAGRITI DHAM

KOLKATA'S MOST COMPREHENSIVE HOME FOR SENIOR LIVING

SAFETY ACTIVITY COMMUNITY SPIRITUALITY

Yoga & meditation

Wellness spa

Indoor games

Privilege access to IBIZA Club

24 x 7 Medical care

Mandir

ROOMS

- Furnished and fully-serviced AC rooms
- TV, balcony, attached toilet and pantry
- Housekeeping and maintenance on call
- Wi-fi, Intercom

SENIOR-FRIENDLY ARCHITECTURE

- Wheel chair and walker-enabled spaces and ramps
- Spacious lifts to accommodate stretchers
- Specially designed bathrooms with wheel chair-accessible showers

SECURITY

- 24 hours manned gate with intercom
- Electronic surveillance, CCTV
- Power back-up

HEALTHCARE

- 24 x 7 ambulance, attendant, emergency healthcare
- Visiting doctors, specialists-on-call
- Emergency button in every room and frequently occupied areas
- Tie-ups with the city's best nursing homes and hospitals

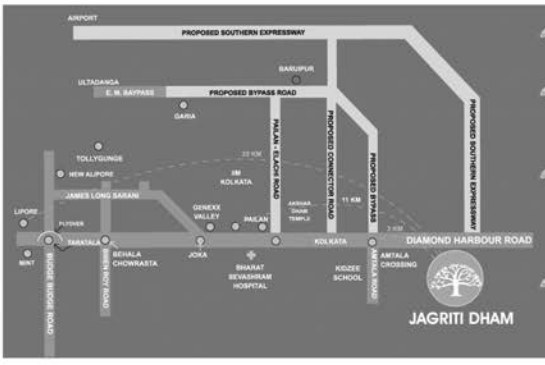

- Inside Merlin Greens complex
- Adjacent to Ibiza on Diamond Harbour Road
- Near Bharat Sevasram Hospital and Swaminarayan Dham Temple
- 5 kms from Nature Cure and Yoga Research Institute

+91 88 200 22022 | Merlin Greens, IBIZA Club, Diamond Harbour Road, Pin 743 503

contact@jagritidham.com | www.jagritidham.com

Issue date 1 February 2020. Registered No. KOL RMS/455/2019-2021
Registered with the RNI NO. WBBEN/2013/49896.
Vol. 8, Issue 3 Arek Rakam

ISO 9001:2008

NIGHTINGALE HOSPITAL

11, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 071
Phone : 2282-7465 / 7462 / 7969 - 72
Doctors Booking (10.00 a.m. to 6.00 p.m.)
98743 26662 / 98743 76667
Fax : 00-91-33-2282-6454
E-mail : feedback@nightingalehospital.com
Website : www.nightingalehospital.com

Published by Trishitananda Roy on behalf of Samaj Charcha Trust from 3rd Floor, 39A/1A, Bosepukur Road, Kolkata–700 042 and printed by him at S. P. Communications Pvt. Ltd., 31B Raja Dinendra Street, Kolkata–700 009.

Rs. 30